মৌর্য্যযুগের ভারতীয় সমাজ

নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম.এ., পি-এচ.ডি.
প্রণীত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
১৯৪৫

মূল্য দুই টাকা

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শুদ্ধি
৩	১	বর্ত্তমান পুস্তিকায়
১০	৫	ব্রাহ্মণ-
১৩	২৬	বিড়ূডভ নামে
১৫	৩	পিপ্পলীবনের "মোরিয়" অর্থাৎ "মৌর্য্য"দের
৩২	৮	মেগাস্থিনিসের
"	২১	দূরে ১২ দণ্ড
৩৩	২৩	প্রসেনজিৎ
"	২৫	বিড়ূডভের
৪১	১	এবং রিজ্ ডেভিডস্
"	৯	হয়। অশোকের
৪২	৪	প্রতিবাসিবর্গকে
৪৩	১৭	২৪ বৎসর
৫৭	১	তখন স্ত্রী পুরুষের
"	২	বিবেচিত হন নাই
৬৩	২০	অমোক্ষো
৭৩	২২	আমোদপ্রমোদের
৮৯	৯	দুর্গা
"	১৪	অন্ত স্থানে
"	২৫	শুক্ল যজুর্ব্বেদে
"	২৬	ভরতনাট্যশাস্ত্রে
১০০	১৪	কথাও বলা প্রয়োজন।
১০১	৮	ছিল। সকলে সাধু
১০৪	১৩	হিন্দুদ্বেষী

সূচীপত্র

মুখবন্ধ

পরলোকগত অধ্যাপক নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম ঐতিহাসিকসমাজে সুপরিচিত। তাঁহার রচিত "মৌর্য্যযুগের ভারতীয় সমাজ" নামক উপাদেয় গ্রন্থে কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রবর্ণিত ভারতসমাজের মনোজ্ঞ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই মূল্যবান্ পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচীনভারতসম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু সাধারণ বাঙালী পাঠকের ধন্যবাদ লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই।

গ্রন্থখানির মুদ্রণকার্য্য সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। সেজন্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সরকারের সম্পাদনায় উহার প্রকাশের ব্যবস্থা হয়। অধ্যাপক সরকার তাঁহার সুলিখিত ভূমিকায় প্রাচীন ভারতীয় সমাজের নানা সমস্যা এবং উহার বিভিন্ন দিক্ সম্পর্কে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করিয়া গ্রন্থের উপযোগিতা বর্দ্ধিত করিয়াছেন। ভূমিকার সহিত সমগ্র গ্রন্থ পাঠ করিলে, ভারতবর্ষের প্রাচীন সমাজসম্বন্ধে সাধারণ পাঠকের মোটামুটি পরিষ্কার ধারণা জন্মিবে বলিয়া আশা করা যায়। গ্রন্থবর্ণিত বিষয়ের উপর মন্তব্য করিতে গিয়া অধ্যাপক সরকার ঐতিহাসিক সত্যের প্রতি যে নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন এবং স্বর্গীয় গ্রন্থকারের প্রতি যে সশ্রদ্ধ মনোভাব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বথা প্রশংসনীয়।

আমরা নিঃসঙ্কোচে গ্রন্থখানি ইতিহাস-রসিক বাঙালী পাঠকের হস্তে তুলিয়া দিতে পারি।

কলিকাতা,
১০ই নভেম্বর, ১৯৪৪

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

ভূমিকা

স্বর্গীয় নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী অধ্যাপক ছিলেন। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রসম্পর্কে গবেষণা করিয়া যে সকল ভারতীয় পণ্ডিত খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় অর্থশাস্ত্রবর্ণিত ভারতীয় সমাজ অবলম্বনে কতিপয় উপাদেয় প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। ঐগুলি তৎকালে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া বিদ্বৎ-সমাজের সমাদর লাভ করে। বৎসর দুই পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ঐ প্রবন্ধগুলি "মৌর্য্যযুগের ভারতীয় সমাজ" নামে স্বতন্ত্র পুস্তিকার আকারে প্রকাশের ব্যবস্থা হয়। গ্রন্থকার অসুস্থ অবস্থায় প্রূফের উপর সামান্য রকমের পরিবর্ত্তন-পরিবর্দ্ধন করিয়া দিতেছিলেন। কিন্তু গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই বিগত ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে মে অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় রক্তচাপবৃদ্ধিজনিত ব্যাধিতে মাত্র ৫২ বৎসর ৩ মাস বয়সে অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। ঐ সময়ে গ্রন্থের প্রথম তিন ফর্ম্মা অর্থাৎ ১-৪৮ পৃষ্ঠা মাত্র ছাপা শেষ হইয়াছিল। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ পুস্তকের অবশিষ্টাংশ ছাপিবার কার্য্যে আমার সাহায্য প্রার্থনা করেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে আমি স্বর্গীয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ছাত্র ছিলাম। সেজন্য পরলোকগত শিক্ষকের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের উদ্দেশ্যে আমি ঐ সাহায্যপ্রস্তাবে আনন্দের সহিত সম্মতি দিলাম।

বর্ত্তমান গ্রন্থের শেষার্দ্ধ অর্থাৎ ৪৯-১০৯ পৃষ্ঠা আমার তত্ত্বাবধানে ছাপা হইয়াছে। সুতরাং এই অংশ সম্পর্কে আমার দায়িত্বের পরিমাণ পাঠক-বর্গের গোচরীভূত করা আবশ্যক। বিশেষতঃ, যাঁহারা সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির সহিত এই অংশ মিলাইয়া পাঠ করিবেন, তাঁহারা কোন কোন বিষয়ে আমার কৈফিয়ৎ চাহিতে পারেন।

অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সমাজ বিষয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে আমার কিছু কিছু মতভেদ আছে। কিন্তু সাধারণ মতভেদ স্থলে আমি কুত্রাপি তাঁহার বিবরণে হস্তক্ষেপ করি নাই। তবে যেখানে সুস্পষ্ট ত্রুটি দেখিতে পাইয়াছি, সেস্থান সংশোধন করাই কর্তব্য মনে করিয়াছি। কারণ, আমার বিশ্বাস, জীবিত থাকিলে অনবধানতাজনিত ঐ প্রকারের ত্রুটিগুলি সুপণ্ডিত গ্রন্থকার মহাশয় নিজেই সংশোধন করিয়া দিতেন। উদাহরণস্বরূপ গ্রন্থের ৮৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। এখানে আছে, "জাতকাদিতে মৎস্যাহারের কথা বিলক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।" পাণ্ডুলিপিতে, অর্থাৎ বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে, ইহার ঠিক পরে ছিল, "এমনকি, একটি জাতকের নামই ইল্লীসজাতক।" ইহা হইতে পাঠকেরা ভাবিতে পারেন, আমাদের পরমপ্রিয় ইলিশ মাছই উল্লিখিত জাতকের বিষয়বস্তু। কিন্তু ইল্লীস নামধেয় জনৈক ব্রাহ্মণ ঐ জাতকের নায়ক বলিয়া গ্রন্থখানির উক্তরূপ নামকরণ হইয়াছে। পালিভাষায় কোন পুস্তকেই মৎস্যবিশেষ অর্থে ইল্লীস শব্দের প্রয়োগ দেখি নাই। এই জন্য আমি গ্রন্থ হইতে ঐ বাক্যটি তুলিয়া দিয়াছি। কোন কোন স্থলে গ্রন্থকার পুস্তকবিশেষের মত উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু পত্রাঙ্কাদি নির্দেশ করেন নাই। উক্তরূপ দুইএকটি ক্ষেত্রে আমি ঐ উক্তি মূল হইতে পরীক্ষা করিবার সময় পাই নাই, উহাতে হস্তক্ষেপও করি নাই। দুইএক স্থলে কিঞ্চিৎ বৈষম্য লক্ষ্য করিয়াও আমি পরিবর্তন করিতে সাহসী হই নাই। সমাজে গণিকার সম্মান সম্পর্কে ৯২ এবং ১০২ পৃষ্ঠায় মন্তব্য তুলনীয়। অনেক ক্ষেত্রে গ্রন্থের ভাষা স্পষ্ট, সুখবোধ্য এবং সুসম্বদ্ধ করার উদ্দেশ্যে আমি কিছু কিছু পরিবর্তন করিয়াছি। দুঃখের বিষয়, আমি নানা কার্যে ব্যতিব্যস্ত থাকায় গ্রন্থখানির জন্য যথেষ্ট সময় ব্যয় করিতে পারি নাই।

প্রাচীন ভারতের সামাজিক ইতিহাস রচনা অতীব দুরূহ কার্য। ভারতবর্ষের আয়তন সুবিশাল। এখানে সভ্যতার বিভিন্ন স্তরবর্তী আর্য্যানার্য্য অসংখ্য জাতির (tribe) বাস। নানা বিশিষ্ট সভ্যতার পারস্পরিক

ঘাতপ্রতিঘাত কোথায় কিভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহা নিরূপণ করা সহজ নহে। অধিকাংশ প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থের কাল এবং রচনা-স্থান নির্ণীত হয় নাই। সুতরাং ঐগুলিতে উল্লিখিত সামাজিক প্রথা প্রভৃতির স্থানকাল নির্দ্দেশ করা সম্ভব হয় না। ধর্ম্মশাস্ত্রাদি সম্পর্কেও এই উক্তি আংশিকভাবে প্রযোজ্য। আবার গ্রন্থবিশেষ-বর্ণিত সামাজিক রীতিনীতি উহার রচনাকালের পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী যুগ-সমূহে এবং উহার রচনা-স্থান ব্যতীত বিশাল ভারতের অন্যত্র প্রচলিত ছিল কিনা, তাহাও নির্ণয় করা কঠিন। অধিকন্তু, প্রাচীন ভারত-সমাজের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ লিখিতে হইলে ভারতীয় সাহিত্যের অগণিত গ্রন্থ, বিদেশীয়গণের বিবরণ এবং অসংখ্য রাজকীয় লিপির বিশ্লেষণ একান্ত প্রয়োজন। এই বিপুল শ্রমসাধ্য কাজ এক ব্যক্তির সাধ্য নহে। সেজন্য কেহ কেহ অংশতঃ প্রাচীন ভারতীয় সমাজ-বিবরণ লিখিতে প্রয়াস করিয়াছেন। কিন্তু বিষয়ের দুরূহতার জন্য এইরূপ গ্রন্থের সংখ্যা অত্যন্ত কম। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লিখিত অর্থশাস্ত্রের সমাজ-বিবরণ প্রাচীন ভারতীয় সমাজের আংশিক বর্ণনা হিসাবে অত্যন্ত মূল্যবান্। পণ্ডিতসমাজে এই গ্রন্থ অবশ্যই সমাদর লাভ করিবে।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত অনেক প্রশ্নে পণ্ডিতগণের ঐকমত্য নাই। সুতরাং আমার সাহায্যে গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইলেও স্বর্গীয় অধ্যাপক মহাশয়ের সমুদয় মতামতে আমার অকুণ্ঠ সমর্থন না থাকিতে পারে। ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছু নাই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, অনেক সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকের মতানুসারে গ্রন্থকার কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রকে মৌর্য্যযুগে রচিত বলিয়া বিশ্বাস করেন (পৃঃ ৪); কিন্তু আমার এবিষয়ে সন্দেহ আছে। আমার বিবেচনায়, কৌটিল্য নামক একজন অর্থশাস্ত্রাচার্য্য খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে মৌর্য্যবংশীয় সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের (আনুমানিক ৩২২-২৯৮ খ্রীষ্ট-পূর্ব্বাব্দ) সমকালে বিদ্যমান থাকিতে পারেন এবং অধুনাবিদিত অর্থশাস্ত্র গ্রন্থখানি মূলতঃ তাঁহারই রচনা হইতে পারে। কিন্তু গ্রন্থখানি যে-আকারে

আমাদের হস্তগত হইয়াছে, উহার সমুদয় অংশ খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে রচিত বলিয়া বিশ্বাস করা কঠিন। অর্থশাস্ত্রে চীনদেশ (২।১১) ও কম্বুদেশের (২।১৩) উল্লেখ আছে। "চীন" শব্দটি চীনদেশের "ৎসিন্" (Tsin) নামক সুপ্রসিদ্ধ রাজবংশের সংজ্ঞা হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে হয়; কিন্তু খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর পূর্ব্বে কোন বিখ্যাত "ৎসিন্" বংশ চীন-দেশে রাজত্ব করে নাই। বর্ত্তমান কাম্বোডিয়ার অন্যতম প্রাচীন হিন্দু নাম কম্বু; কিন্তু খ্রীষ্টের পূর্ব্বে ঐ অঞ্চলের সহিত ভারতবর্ষের কোনরূপ যোগাযোগ ছিল বলিয়া মনে করা যায় না। অর্থশাস্ত্রের ভাষা, রচনাবিন্যাস প্রভৃতিও খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর অনুরূপ প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না। এসম্পর্কে একটি প্রধান লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, অর্থশাস্ত্রে (২।৬) রাজকীয় শাসনাদির তারিখ লিখিবার যে-পদ্ধতির উল্লেখ পাওয়া যায়, উহা খ্রীষ্টের পূর্ব্বেকার নহে। কৌটিলীয় গ্রন্থমতে, তারিখে রাজবর্ষ (রাজার সিংহাসন লাভের সময় হইতে গণিত বৎসরাঙ্ক), মাস, পক্ষ এবং দিবসের উল্লেখ থাকিবে। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় রাজশাসনাদি হইতে জানা যায় যে, ভারতবর্ষে এইরূপ বর্ষ-মাস-পক্ষ-দিবস সম্বলিত তারিখের ব্যবহার খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল না। এই সকল কারণে মনে হয়, অর্থশাস্ত্র মূলতঃ কৌটিল্যকর্ত্তৃক খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে রচিত হইয়া থাকিলেও, উহার অনেক অংশ পরবর্ত্তী কালের রচনা এবং প্রক্ষিপ্ত। বর্ত্তমান আকারে গ্রন্থখানির সঙ্কলনকাল খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করা সম্ভব নহে। আমার ধারণা, কৌটিল্য ছিলেন অর্থশাস্ত্রের একজন প্রধান আচার্য্য এবং ঐ বিদ্যা-শিক্ষার এক নবীনধারা-প্রবর্ত্তক (founder of a new school of political philosophy)। তিনি স্বীয় মতবাদ স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন কিংবা মৌখিকভাবে শিষ্যগণকে উপদেশ করিতেন, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। তবে শিষ্য-প্রশিষ্যানুক্রমে দীর্ঘকাল ধরিয়া যে অর্থশাস্ত্রবেত্তৃগণ কৌটিলীয় মতবাদ বহন করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহারাই লিখিত বা অলিখিত কৌটিলীয় গ্রন্থখানিকে যুগে যুগে

কিয়ৎপরিমাণে সংস্কৃত করিয়া গিয়াছেন। ভরতের নাট্যশাস্ত্র, বাৎস্যায়নের কামসূত্র প্রমুখ অনেক প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থই এইরূপ সংস্কৃত কলেবরে আমাদের হস্তগত হইয়াছে। যাহা হউক, অর্থশাস্ত্রের সমুদয় অংশ মৌর্য্যযুগে রচিত বলিয়া বিশ্বাস না করিলে, তদবলম্বনে লিখিত সমাজবিবরণকে "মৌর্য্যযুগের ভারতীয় সমাজ" না বলিয়া "কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রবর্ণিত ভারতীয় সমাজ" বলা যাইতে পারে। কিন্তু এইরূপ সমাজ-বিবরণ সম্পর্কে একটা কথা বলিবার আছে।

ধর্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্রাদিবর্ণিত সমাজবিবরণ অনেকাংশে আদর্শমূলক ও বাচনিক (theoretical)। যে স্থান-কাল-পাত্রসম্বন্ধীয় সমাজের কথা ঐ সকল গ্রন্থ হইতে জানা যায় * তাহারও প্রকৃত অবস্থা উহাতে সম্পূর্ণ ব্যক্ত না হইতে পারে। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে (৬।১।৩৮-৩৯) বলা হইয়াছে—

> ন শাস্ত্রমস্তীত্যেতাবৎ প্রয়োগে কারণং ভবেৎ।
> শাস্ত্রার্থান্ ব্যাপিনো বিদ্যাৎ প্রয়োগাংস্ত্বেকদেশিকান্॥
> রসবীর্য্যবিপাকা হি শ্বমাংসস্যাপি বৈদ্যকে।
> কীর্ত্তিতা ইতি তৎ কিং স্যাদ্ ভক্ষণীয়ং বিচক্ষণৈঃ॥

ইহাতে শাস্ত্রের ব্যাপকতার উল্লেখ করিয়া উহার আদর্শমূলকতা মানিয়া লওয়া হইয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্রাদির সমাজবিবরণ যে সর্ব্বথা লোকব্যবহারানু-গত না থাকিতে পারে, তাহার প্রমাণ আছে। এস্থলে উহার দুইএকটির উল্লেখ করা যাইতেছে।

গ্রন্থের ৬১ পৃষ্ঠায় অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণের কন্যার বাল্যবিবাহ সমর্থক উক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। সত্যই মধ্যযুগের

* বোধায়নের ধর্মসূত্র মতে দাক্ষিণাত্যদিগের সমাজে মামাত-পিসতুত ভাইবোনের বিবাহ সিদ্ধ। কিন্তু মনুসংহিতায় ইহার উল্লেখ নাই। ইহাতে বোধায়ন ও মনুর গ্রন্থ মধ্যে কিঞ্চিৎ স্থান ও পাত্রগত প্রভেদ সূচিত হয়। এইরূপ কালগত প্রভেদেরও উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। মধ্যযুগীয় নিবন্ধকারগণের অনেক মত প্রাচীন গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত এবং গতানুগতিক। উহা তাঁহাদের কালসম্পর্কে সত্য না হইতে পারে।

নিবন্ধকারগণ সকলেই বালিকা কন্যার বিবাহের পক্ষপাতী। অবশ্য গৃহ্যসূত্রে বিবাহের চতুর্থরাত্রিতে চতুর্থীকর্ম্ম বা সহবাসের ব্যবস্থা থাকায় এবং অন্যান্য প্রমাণ বলে, সুপ্রাচীন ভারতসমাজে কন্যার যৌবনবিবাহ সিদ্ধ হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সমাজে পরেও যে বয়স্কা কন্যার বিবাহ প্রচলিত ছিল, তাহা মধ্যযুগীয় সংহিতাকারগণের গ্রন্থ হইতে জানা যায় না, অন্য প্রমাণে বোধগম্য হয়। এই প্রসঙ্গে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে রচিত বাণভট্টের হর্ষচরিত গ্রন্থে (চতুর্থ উচ্ছ্বাস) প্রাপ্ত থানেশ্বররাজকন্যা রাজ্যশ্রীর বিবাহের বিবরণ প্রণিধানযোগ্য। বাণের বর্ণনা অনুসারে বিবাহের পূর্ব্বে রাজকন্যা রাজ্যশ্রী "যৌবনম্ আরুরোহ"। সম্প্রাপ্তযৌবনা রাজ্যশ্রীর পিতা তাঁহার মাতাকে বলিতেছেন, "দেবি, তরুণীভূতা বৎসা রাজ্যশ্রীঃ। দহয়ম্ অহ্নকারগতি মে দিবসম্ ইব পয়োধরোন্নতিরস্যাঃ।" স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, অবিবাহিতা রাজ্যশ্রীকে যুবতী, তরুণী এবং উন্নতপয়োধরা বলা হইয়াছে। সুতরাং মধ্যযুগীয় নিবন্ধকারগণের আদেশমত শিশু বালিকা বয়সে, অর্থাৎ "অষ্টবর্ষা ভবেদ্ গৌরী নববর্ষা চ রোহিণী। দশমে কন্যকা প্রোক্তা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা॥" ইত্যাদি স্মার্ত্তমতানুসারে, তাঁহার বিবাহ হয় নাই।

৭ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণদিগের নানাবিধ সামাজিক সুবিধার আলোচনা করিয়াছেন। ২৬ পৃষ্ঠাতেও ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত ভূমিতে তাঁহার দানবিক্রয়ের অধিকারের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে উক্তরূপ ব্রাহ্মণপ্রাধান্যের বিরোধী উদাহরণও কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারতে (১।১০৭) দেখি, মিথ্যা চুরির অভিযোগে মহামুনি মাণ্ডব্য শূলে আরোপিত হইয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থেই (১২।২৩) দেখা যায়, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিনা অনুমতিতে তদীয় আশ্রমবৃক্ষের ফল ভক্ষণ করায় রাজবিচারে মহর্ষি লিখিতের হস্তদ্বয় ছেদন করা হইয়াছিল। পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ (Vedic Index, II, p 80) অনুসারে, বিদ্রোহী রাজপুরোহিতের প্রাণদণ্ড হইতে পারিত। কোন কোন ব্যাখ্যামতে অর্থশাস্ত্রেও (৪।১১) রাজদ্রোহী ব্রাহ্মণকে জলে ডুবাইয়া

মারিবার বিধি আছে। তবে এস্থলে মূলে কিছু ভাষাগত ত্রুটি দেখা যায়। ব্রহ্মস্বসম্পর্কিত ধর্ম্মশাস্ত্রীয় নিয়ম সম্বন্ধে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর একটি মূল্যবান্ সাক্ষ্য আছে। বাকাটকবংশীয় মহারাজ দ্বিতীয় প্রবরসেন ব্রাহ্মণদিগকে ভূমিদান করিয়া সাবধান করিয়া দিতেছেন, "শাসনস্থিতিশ্চ ইয়ং ব্রাহ্মণৈরীশ্বরৈশ্চ অনুপালনীয়া; তদযথা রাজ্ঞাং সপ্তাঙ্গে রাজ্যে অদ্রোহপ্রবৃত্তানাং, ব্রহ্মঘ্ন-চৌর-পারদারিক-রাজাপথ্যকারি প্রভৃতীনাং সংগ্রামং কুর্ব্বতাম্, অন্যগ্রামেষু অনপরাদ্ধানাম আচন্দ্রাদিত্য-কালীয়ঃ; অতঃ অন্যথা কুর্ব্বতাম্ অনুমোদতাং বা রাজ্ঞঃ ভূমিচ্ছেদং কুর্ব্বতঃ অস্তেয়ম ইতি।" ধর্ম্মশাস্ত্রে বর্ণিত ব্রাহ্মণমাহাত্ম্য সম্পূর্ণরূপে লোক-ব্যবহারানুগত হইলে রাজার পক্ষে ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত ভূমি সম্বন্ধে সর্ত-আরোপ এবং বাজেয়াপ্ত করিবার ভয়প্রদর্শন সম্ভব হইত না।

৭ পৃষ্ঠায় মৌর্য্যযুগীয় বৈশ্যদিগের শাস্ত্রানুমোদিত বৃত্তির বিষয় লেখা হইয়াছে। কিন্তু ঐ সময়ে বৈশ্যেরা যে কেবল কৃষিবাণিজ্যাদি দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিত, তাহা প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য নহে। ১৫০ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ রুদ্রদামের জুনাগড় লিপি হইতে জানা যায়, মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের অধীনে সুরাষ্ট্র অর্থাৎ আধুনিক দক্ষিণ-কাঠিয়াবাড়ের রাষ্ট্রিয় (প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা) পুষ্যগুপ্ত বৈশ্যজাতীয় ছিলেন। হর্ষবর্দ্ধন প্রমুখ প্রাচীন ভারতের কোন কোন মহাপরাক্রান্ত নরপতিও বৈশ্য ছিলেন বলিয়া জানা যায়। আবার বর্ণবৈষম্যের কড়াকড়ি যে মধ্যযুগের পূর্ব্বে অন্ততঃ ভারতের অনেক স্থলে তেমন কঠোর ছিল না, তাহার প্রমাণ আছে। ৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ মন্দসোর শিলালিপি হইতে বুঝা যায়, লাটদেশের (আধুনিক নৌসারী-ভরোচ অঞ্চল) একটি রেশমশিল্প ব্যবসায়ী তন্তুবায়শ্রেণী পশ্চিম-মালবের অন্তর্গত দশপুরে উপনিবেশ স্থাপন করে। কিন্তু নূতন দেশে তাহারা কেহ কেহ ধনুর্দ্ধর, গল্পকথক, ধর্ম্মতত্ত্বব্যাখ্যাতা, জ্যোতির্বিৎ, যোদ্ধা ও তপস্বীর জীবন বরণ করিয়াছিল অবশ্য অধিকাংশ আপনাদের প্রাচীন ব্যবসায়েই টিকিয়া ছিল। বুলন্দ-শহর জেলার ইন্দোর গ্রামে প্রাপ্ত স্কন্দগুপ্তের তাম্রশাসনে (৪৬৫ খ্রীঃ)

অচলবর্ম্মা ও ভকুণ্ঠসিংহ নামক দুইজন ক্ষত্রিয়কে বণিক্ বলা হইয়াছে। মহাভারতে দ্রোণাদি ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বনের কাহিনী সকলেই অবগত আছেন। চতুর্থ শতাব্দীতে কর্ণাটবাসী ব্রাহ্মণ কদম্ববংশীয় ময়ূর শর্ম্মার বংশধরগণ "বর্ম্মা" পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। গুপ্তযুগের শাসনে অনেক ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণাদি কুটুম্বী বা চাষী গৃহস্থকে "অকর্ষণা-বিরোধিস্থানে" রাজদত্ত ভূমি মাপিয়া দিতে আদেশ করা হইয়াছে। ৪৭৯ খ্রীষ্টাব্দের কলাইকুড়ি লিপিতে কুটুম্বীদিগের "শর্ম্মা" নামান্ত দেখা যায়। ইহাতে সমাজে কৃষক ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। আবার হিউএনৎসং শূদ্রদিগকে কৃষিকার্য্যনিরত দেখিয়াছিলেন। অলবীরুনী ও বৈশ্যশূদ্রে কোন প্রভেদ দেখিতে পান নাই। এইরূপ চারিবর্ণের লোকদ্বারা শাস্ত্রের অননুমোদিত বৃত্তি অবলম্বনের অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। সুতরাং বর্ণগত বৃত্তিভেদ একরূপ বাচনিক বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়।

আসল কথা এই যে, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের কোন যুগেই চতুর্বর্ণমূলক সামাজিক বিভাগ সুব্যবস্থিত ছিল না। মূলতঃ বর্ণশব্দ আর্য্য ও অনার্য্য জাতির গাত্রবর্ণভেদের দ্যোতক ছিল। সুপ্রাচীন আর্য্য-সাহিত্যে আর্য্য ও অনার্য্যের সামাজিক ও সংস্কৃতিগত প্রভেদ বুঝাইতে আর্য্যবর্ণ ও দাসবর্ণ শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। কালক্রমে ভারতীয় সমাজের চারিটি বাচনিক স্তর বুঝাইতে বর্ণশব্দের এবং বর্ণান্তর্গত বিভিন্ন সামাজিক অঙ্গ বুঝাইতে জাতিশব্দের ব্যবহার সুপ্রচলিত হয়। জাতিশব্দের যৌগিক অর্থ জন্ম; কিন্তু প্রাচীন চতুর্ব্বর্ণবিভাগ জন্মগত পার্থক্যের উপর নির্ভরশীল ছিল না। সভ্যতার বিভিন্ন স্তরবর্ত্তী অনেক আর্য্যেতর জাতি (tribe) ক্রমে ক্রমে অল্পাধিক পরিমাণে আর্য্যদিগের সংস্কৃতি ও রক্তসংমিশ্রণ লাভ করিয়া আর্য্যসমাজের অঙ্গীভূত হইতে চলিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের নিজস্ব নাম ও অনেক সামাজিক বৈশিষ্ট্য বিসর্জ্জিত হয় নাই। ফলে ইহাদের দ্বারা ভারতীয় আর্য্যসমাজের মধ্যে নানা প্রভেদের সৃষ্টি হইতেছিল। এই সকল সামাজিক প্রভেদের

সামাদি অনেক বৈশিষ্ট্য জন্মগত। সম্ভবতঃ এই কারণেই পরে জন্মগত সামাজিক প্রভেদ বুঝাইতে জাতিশব্দের ব্যবহার সুপ্রচলিত হয়। ক্রমে বৃত্তিমূলক সাম্প্রদায়িক প্রভেদও জন্মগত বলিয়া স্বীকৃত হইতে আরম্ভ হয়।* এমন কি, কেহ কেহ চতুর্বর্ণবিভাগকে জন্মের উপর নির্ভরশীল বলিয়া প্রচার করিতে থাকেন। কিন্তু এই মত যে প্রাচীন যুগে সর্ব্ব-স্বীকৃত হয় নাই, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। মহাভারত (১৩।১৪৩। প্রভৃতি গ্রন্থে অনেক স্থলে সামাজিক মর্য্যাদাসম্পর্কে জন্ম অপেক্ষা বৃত্তির প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে।—

এভিস্তু কর্মভির্দেবি শুভৈরাচরিতৈস্তথা।
শূদ্রো ব্রাহ্মণতাং যাতি বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়তাং ব্রজেৎ॥
এতৈঃ কর্মফলৈর্দেবি ন্যূনজাতিকুলোদ্ভবঃ।
শূদ্রোপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ॥
কর্মভিঃ শুচিভির্দেবি শুদ্ধাত্মা বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
শূদ্রোপি দ্বিজবৎ সেব্য ইতি ব্রহ্মাব্রবীৎ স্বয়ম্॥
ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ।
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্॥
সর্বোঽয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন তু বিধীয়তে।
বৃত্তে স্থিতস্তু শূদ্রোপি ব্রাহ্মণত্বং নিয়চ্ছতি॥ ...
এতত্তে গুহ্যমাখ্যাতং যথা শূদ্রো ভবেদ্দ্বিজঃ।
ব্রাহ্মণো বা চ্যুতো ধর্মাদ্ যথা শূদ্রত্বমাপ্নুতে॥

অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে যেরূপ tribe হইতে caste এর উদ্ভব হইয়াছে,† প্রাচীন ভারতের সামাজিক ইতিহাসেও ঠিক সেইরূপ

* পরবর্তী কালে কায়স্থ এবং বাংলার বৈদ্যগণ বৃত্তিমূলক সম্প্রদায় হইতে জাতিতে পরিণত হইয়াছে।

† কোচ, ভূমিজ, মুণ্ডা ইত্যাদির দৃষ্টান্ত উল্লেখনীয়। Risley People of India pp 72-76 দ্রষ্টব্য। এইরূপেই বৈদেশিক গুর্জরাদি ছত্রিশটি প্রধান রাজপুতক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্তে পরিণত হইয়াছে।

দেখিতে পাওয়া যায়। মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারেরা আর্য-অনার্য, সভ্য-অসভ্য সমুদয় ভারতীয় ও ভারতাগত বিদেশীয় জাতি (tribe) ও সম্প্রদায় (class) প্রভৃতিকে বাচনিকভাবে চতুর্বর্ণের কাঠামোতে পুরিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কোন tribe এর তৎকালীন বৃত্তি ও সামাজিক মর্যাদার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা উহাকে চারিবর্ণের অন্তর্গত যে কোন দুইতিনটির সংযোগে উৎপন্ন বলিয়া নির্দেশ করিতেন; কারণ উহাকে চতুর্বর্ণের কাঠামোর মধ্যে যেরূপেই হউক খাড় করাইতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ অম্বষ্ঠ, অন্ধ্র, শক (Scythian), যবন (Greek) প্রভৃতি জাতির এবং সৈরিন্ধ্র, অস্ত্রব্যবসায়ী প্রভৃতি বৃত্তিমূলক সম্প্রদায়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে (মনুসংহিতা, ১০ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। মাহিষ্য (অর্থাৎ, মহিষদেশবাসী) প্রভৃতি কোন কোন জাতিকে উল্লিখিত কাঠামোতে স্থান দিতে মনু ভুলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য এবং অন্যান্যেরা সে ত্রুটি সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। বিদেশীয় শক এবং যবন জাতি মনুর মতে লুপ্তক্রিয় ক্ষত্রিয়; কিন্তু মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির মতে ইহারা অনিরবসিত শূদ্র অর্থাৎ সৎশূদ্র। অবশ্য ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সৎশূদ্র ও লুপ্তক্রিয় ক্ষত্রিয়ের সামাজিক মর্যাদা সমপর্যায়ের বলিয়াই মনে হইবে। এই প্রসঙ্গে মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের সহিত যবন সেলিউকসের এবং দাক্ষিণাত্যের শাতবাহন ও ইক্ষ্বাকু রাজবংশের সহিত উজ্জয়িনীর শক ক্ষত্রপগণের বৈবাহিক সম্বন্ধস্থাপনের কাহিনী উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত দুইটি ভারতীয়গণকর্তৃক বিদেশীয়জাতির কন্যাগ্রহণের দৃষ্টান্ত। মনু অম্বষ্ঠদিগকে তাহাদের চিকিৎসাবৃত্তির অনুরূপ সামাজিক মর্যাদা দানকল্পে ব্রাহ্মণের বৈশ্যাসংসর্গজাত সঙ্করজাতি বলিয়াছেন। কিন্তু পুরাণে ইহাদিগের "আনব (যযাতিপুত্র অনুর বংশীয়) ক্ষত্রিয়" আখ্যা পাওয়া যায়। ভারতীয় ও গ্রীক সাহিত্যে কোন কোন স্থলে অম্বষ্ঠদিগকে যুদ্ধব্যবসায়ী, কৃষিজীবী, পুরোহিত প্রভৃতির কার্য্যে নিযুক্ত দেখা যায়। আধুনিক কালে, বিহারের অম্বষ্ঠেরা কায়স্থসম্প্রদায়ভুক্ত; কিন্তু তামিল ও মলয়ালম্ ভাষী অম্বষ্ঠগণ ক্ষৌরকার ও শল্যচিকিৎসক। কোন কোন অপ্রাচীন গ্রন্থমতে বাংলার

বৈদ্যগণও অম্বষ্ঠ। অবশ্য পূর্বভারতে রচিত ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে (আ° ১৩শ শতাব্দী), অম্বষ্ঠ (সম্ভবতঃ বিহারের অম্বষ্ঠকায়স্থ) ও বৈদ্যের স্বতন্ত্র উল্লেখ হইতে এই মতের অর্বাচীনতা এবং অনৈতিহাসিকতা প্রমাণিত হয়।* বিভিন্ন অঞ্চলে উপনিবিষ্ট একই অম্বষ্ঠ জাতির বর্তমান সামাজিক বৈষম্য হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আধুনিক সম্প্রদায়গত বিবাহ ও পঙ্‌ক্তি-ভোজনের বিধিনিষেধমূলক কঠোরতার অনেক স্থলেই কিছুমাত্র ঐতিহাসিক মূল্য নাই। যাহাহউক বর্তমান গ্রন্থের ২ পৃষ্ঠায় প্রাচীন ভারতসমাজের যে শাস্ত্রীয় চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাকে সর্বথা ইতিহাসসম্মত মনে করা কঠিন।

উপরে যাহা লেখা হইল পরমশ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মহাশয়ের কোন ভ্রম প্রদর্শন তাহার উদ্দেশ্য নহে। কারণ শাস্ত্রাদির অনুবর্তন করিয়া তিনি যাহা লিখিয়াছেন, সেই শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে লোকব্যবহারানুগত ছিল কিনা, তাহাই আমরা বিশ্লেষণ করিয়াছি। এই আলোচনার প্রধান

* প্রসঙ্গতঃ অপর একটি অনৈতিহাসিক সামাজিক সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিতে পারি। বাংলার ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যসমাজে কৌলীন্যের উৎপত্তির সহিত সেনবংশীয় রাজা বল্লাল সেনের সম্পর্কের কাহিনী সকলেই অবগত আছেন। কাহিনীটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক এবং সম্পূর্ণরূপে ঐতিহাসিকত্ববর্জিত বলিয়া মনে হয়। কৌলীন্য প্রধানতঃ ধনকর্মাদি-মূলক এবং ঘটক ও কুলপঞ্জীকারগণকর্তৃক নির্দিষ্টকৃত, বল্লালের সৃষ্ট নহে। অন্ততঃ বৈদ্যসমাজের পক্ষে এইরূপ সিদ্ধান্ত ভরত মল্লিক কৃত চন্দ্রপ্রভা (১৬৭৫ খ্রী°) এবং কবিকণ্ঠহারকৃত সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জিকা (১৬৫৩ খ্রী°) হইতে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়। বৈদ্য-দিগের প্রাচীনতামধ্যে ভরত বল্লালের নাম করেন নাই। তাঁহার মতে কৌলীন্যের সৃষ্টি মুখ্যতঃ সদাচার হইতে। কিন্তু "ধন হইতেই কৌলীন্য" এইরূপ উক্তিকেও তিনি উড়াইয়া দেন নাই, তবে বলিয়াছেন যে, ধনের সহিত সদাচারও থাকা চাই। এদিকে সদ্বৈদ্যকুল-পঞ্জিকাতে স্পষ্ট বলা হইয়াছে, "প্রাচীন মতে" সদাচার হইতেই কৌলীন্যের উদ্ভব; কিন্তু "আধুনিকেরা" বৈদ্যবংশীয় রাজা বল্লালকে বৈদ্যসমাজে কৌলীন্য-ব্যবস্থাপক বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন। (—আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্ নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্। প্রাচীনমতমেতদ্ধি বদন্ত্যাধুনিকাঃ পুনঃ। পুরা বৈদ্যকুলোদ্ভূতবল্লালেন মহীভুজা। ব্যবস্থাপিতকৌলীন্যং ভুক্তিসেনাদিবংশজে॥)

ব—1312B.

উদ্দেশ্য এই যে, আমাদের উভয়ের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করিয়া বর্ত্তমান গ্রন্থখানি পাঠ করিলে প্রাচীন ভারতীয় সমাজসম্পর্কে পাঠকগণের অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট ধারণা হইবে।

গ্রন্থকার অসুস্থ অবস্থায় পুস্তকের প্রথমাংশ সংশোধন করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, সেজন্য উহাতে দুইএকটি তথ্যগত ত্রুটি প্রবেশ করিয়াছে। মনে হয়, তিনি সুস্থশরীরে ঐ অংশ সংশোধন করিলে কোনরূপ ত্রুটি থাকিত না। কিন্তু তাঁহার ন্যায় স্বনামখ্যাত ঐতিহাসিকরচিত গ্রন্থের মতামত পাঠক-সাধারণের উপর অবশ্যই প্রভাব বিস্তার করিবে সুতরাং এস্থলে উহার দুই একটির বিষয়ে সংক্ষেপে আমাদের মনোভাব প্রকাশ করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কারণ, আমার বিশ্বাস, অধ্যাপক মহাশয় সুস্থশরীরে বর্ত্তমান থাকিলে এই ত্রুটিগুলি সংশোধন করিয়া দিতেন অথবা এসম্পর্কে মতভেদাদির উল্লেখ করিতেন।

২ পৃষ্ঠা।—গ্রীকবীর আলেকজান্দার মগধসম্রাটের ভয়ে পলায়ন করিয়াছিলেন, এই ধারণার সমর্থক কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই। অবশ্য তাঁহার সৈন্যগণকে তিনি নানা চেষ্টাতেও বিপাশা নদী অতিক্রমপূর্ব্বক পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হওয়ায় বাধ্য করিতে সমর্থ হন নাই।

২৪ পৃষ্ঠা।—বর্ত্তমান মনুসংহিতাকে মৌর্য্যযুগের অব্যবহিত পরবর্ত্তী কালের গ্রন্থ মনে করা কঠিন অবশ্য মনুনামধেয় একজন প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রকার মৌর্য্যগণের বহুকাল পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া মনে করা যায়; কিন্তু মনুসংহিতা যে-আকারে আমাদের হস্তগত হইয়াছে, উহা খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর অধিককাল পূর্ব্বেকার বলিয়া বোধ হয় না চারিবর্ণের লোকের নামকরণসম্বন্ধে মনুসংহিতা (২।৩১-৩২) বলেন—

মঙ্গল্যং ব্রাহ্মণস্য স্যাৎ ক্ষত্রিয়স্য বলান্বিতম্।
বৈশ্যস্য ধনসংযুক্তং শূদ্রস্য তু জুগুপ্সিতম্॥
শর্ম্মবদ্ ব্রাহ্মণস্য স্যাদ্ রাজ্ঞো রক্ষাসমন্বিতম্।
বৈশ্যস্য পুষ্টিসংযুক্তং শূদ্রস্য প্রৈষ্যসংযুতম্॥

এই প্রসঙ্গে "শর্ম্মা দেবশ্চ বিপ্রস্য বর্ম্মা ত্রাতা চ ভূভুজঃ।
ভূতির্দত্তশ্চ বৈশ্যস্য দাসঃ শূদ্রস্য কারয়েৎ॥"
"শর্ম্মান্তং ব্রাহ্মণস্য স্যাদ্ বর্ম্মান্তং ক্ষত্রিয়স্য চ।
গুপ্তদাসাত্মকং নাম প্রশস্তং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ॥"

ইত্যাদি উত্তরকালীন স্মৃতির বচন উল্লেখনীয়। যাহা হউক, ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্য এবং লেখাবলী হইতে কিন্তু জানা যায় যে, বর্ণবৈষম্যমূলক নামকরণ খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতীয় সমাজে অজ্ঞাত ছিল। এমন কি, উহার অনেক পরেও ঐরূপ নামকরণব্যবস্থা সমাজে সর্ব্বগ্রাহ্য হয় নাই। বাংলাদেশের তিন্দুপদ্ধতিসমূহের অধিকাংশ কোন পূর্ব্বপুরুষের নামের শেষাংশ উত্তরপুরুষগণকর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট-নামান্ত হিসাবে অবলম্বনের ফলে উদ্ভূত হইয়াছে। গুপ্তযুগের বাংলায় নামান্ত ব্যবহারে বর্ণগত বৈষম্য বিশেষরূপে লক্ষিত হয় না। বাংলা অঞ্চলে আবিষ্কৃত সপ্তম ও দশম শতাব্দীর লিপিতেও ব্রাহ্মণগণের বসু, ঘোষ, দত্ত, দাস, ভূতি, পালিত, কুণ্ড, নাগ, সোম, নন্দী, সেন এবং গুপ্ত স্থির-নামান্ত বা পদ্ধতি দৃষ্ট হয়। আধুনিক বাঙালী ব্রাহ্মণসমাজে ইহার কোন পদ্ধতিই প্রচলিত নাই; কিন্তু ব্রাহ্মণেতর কায়স্থাদি সম্প্রদায়ে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্যই পণ্ডিতেরা মনে করেন, প্রাচীন কালের অনেক ব্রাহ্মণপরিবার কায়স্থ প্রভৃতির সমাজে মিশিয়া গিয়াছে। দাক্ষিণাত্যের চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীর লিপিতে ভবকোটিগুপ্ত, ভবস্কন্দ-ত্রাত প্রভৃতি ব্রাহ্মণের অব্রাহ্মণোচিত নাম পাইয়াছি। বংশব্রাহ্মণেও এইরূপ কতকগুলি নাম আছে।

৭০ পৃষ্ঠা।—গ্রীক লেখকদিগের বিবরণে ভারতীয় census বা লোক-গণনার কোন উল্লেখ দেখি নাই। তবে মেগাস্থিনিস লিখিয়াছেন যে, পাটলিপুত্রনগরে জন্মমৃত্যুর হিসাব রাখিবার ভার একটি অমাত্য-সঙ্ঘের উপর ন্যস্ত ছিল।

৪০ পৃষ্ঠা।—অর্থশাস্ত্রবর্ণিত সমাজে বর্ত্তমান ভারতের ন্যায় কঠোর অবরোধপ্রথা ছিল না, এরূপ সিদ্ধান্ত করা সহজ নহে। অন্ততঃ বর্ত্তমানের

তুলনায় সেযুগে নারীর সামাজিক স্বাধীনতা কম ছিল। কৌটিলীয় মতে, দিবাভাগে ক্রীড়াদি দর্শনের জন্য, কিংবা অপর কোন স্ত্রীলোকের সহিত সাক্ষাতের জন্য, কিংবা বেড়াইবার উদ্দেশ্যে গৃহের বাহিরে গেলে নারীদিগের ৬ পণ (৮০ রতি ওজনের তাম্রমুদ্রা) জরিমানা হইত। এস্থলে বলিয়া রাখা ভাল যে, প্রাচীন ভারতে মুদ্রার ক্রয়শক্তি অত্যন্ত অধিক ছিল। সুতরাং ৬ পণ নিতান্ত লঘু দণ্ড নহে। এই জরিমানা সম্পন্না গৃহস্থনারীর স্ত্রীধন হইতে দেওয়া হইত কিনা, তাহা জানা যায় না। যাহা হউক, কোন পুরুষের সহিত সাক্ষাতের জন্য অথবা ক্রীড়া করিবার জন্য বাহিরে গেলে নারীর ১২ পণ দণ্ড নির্দিষ্ট ছিল। পতির নিদ্রিত বা সুরাপ্রমত্ত অবস্থায় পত্নী বাহিরে গেলে, তাহার ১২ পণ দণ্ড হইত। কিন্তু এই সকল অপরাধ রাত্রিকালে অনুষ্ঠিত হইলে দ্বিগুণ দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। সন্দেহজনক স্থানে গোপন আলাপের অপরাধে বেত্রদণ্ড দেওয়া চলিত। গ্রামের প্রকাশ্য স্থানে কোন চণ্ডালকে দিয়া অপরাধিনী নারীর দক্ষিণ ও বাম ভাগে পাঁচ বার করিয়া বেত্রাঘাতের বিধি ছিল। একস্থলে অপরাধের মাত্রানুসারে দণ্ডের ক্রমিক হ্রাসবৃদ্ধির ব্যবস্থা দেখা যায়। বিপদ্ ব্যতীত অপর কোন অজুহাতে পতিগৃহ হইতে বাহির হইলে নারীর দণ্ড ৬ পণ; স্বামীর আদেশ লঙ্ঘন করিয়া বাহির হইলে ১২ পণ; প্রতিবাসিগণের বাড়ী ছাড়াইয়া বাহিরে গেলে ৬ পণ; কোন প্রতিবাসীকে গৃহাভ্যন্তরে আনয়ন করিলে ১২ পণ. স্বামীর আদেশ লঙ্ঘন করিয়া কোন প্রতিবাসীকে গৃহে আনিলে প্রথম সাহস দণ্ড অর্থাৎ ২৫০ পণ জরিমানা। আবার পাড়ার বাহিরে গেলে সে অপরাধের দণ্ড ছিল ২৪ পণ। ভিন্নগ্রামে উপস্থিত হইলে ১২ পণ দণ্ড হইত; অধিকন্তু নারী তাহার স্ত্রীধন ও অলঙ্কারাদি হইতে বঞ্চিত হইত। জীবিকার্থ প্রাণাধন গ্রহণ এবং তীর্থ গমন ব্যতীত অপর কোন কারণে পরপুরুষের সহিত স্থানান্তরে গেলে নারীর মাত্র ২৪ পণ দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল; কিন্তু সে তাহার সামাজিক অধিকার হারাইত। স্বেচ্ছায় ব্যভিচার করিলে নারীর নাসাকর্ণচ্ছেদন অথবা ৫০০ পণ অর্থদণ্ড

নির্দ্ধারিত ছিল। একস্থলে রাজার ক্রীতদাসীর এই অপরাধের দণ্ড দেখা হইয়াছে। অবশ্য মনুসংহিতার স্থায় কর্তব্যভ্রষ্টা নারীকে প্রকাশ্য স্থানে কুকুর দিয়া খাওয়াইবার বিধান অর্থশাস্ত্রে নাই। কিন্তু মহাভারত, বিষ্ণুসংহিতা, রত্নাবলী প্রভৃতি গ্রন্থের স্থায় খোজা প্রহরীর দ্বারা রাজান্তঃপুর রক্ষার ব্যবস্থাও অর্থশাস্ত্রে দেখা যায়। যাহা হউক, এই সমুদয় উক্তি কোন একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান এবং কাল সম্পর্কে সত্য হইতে পারে। ইহা হইতে প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন যুগে নারীর সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা সম্যকরূপে প্রমাণিত হয় না। বিশেষতঃ, উক্ত বিবরণটিকে আমরা অনেকাংশে বাচনিক বলিয়া মনে করি। কিন্তু উপরে উদ্ধৃত বর্ণনা হইতে অর্থশাস্ত্রীয় (৩।৭ ; ৪।১১-১৩) সামাজিক ব্যবস্থায় নারীর শোচনীয় অবস্থা স্পষ্ট বুঝা যায়। মৌর্য্যবংশীয় অশোকের (খ্রী° পূ° ২৭৩-৩২) অনুশাসনে অন্তঃপুর অর্থে "অবরোধন" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই শব্দের ধাতুগত অর্থ হইতে নারীর স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ সূচিত হয়। এ স্থলে পতঞ্জলিকৃত মহাভাষ্যে কথিত রাজ-পুরমহিলাগণের অসূর্য্যম্পশ্যতার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

৬৩-৬৪ পৃষ্ঠা। নারীর বহুবার বিবাহের সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মহাভারত বর্ণিত (৫ ১০৬ হইতে) মাধবীর কাহিনীতে দেখিতে পাই। বিশ্বামিত্রশিষ্য মহর্ষি গালব দক্ষিণাগ্রহণের জন্ত বারবার পীড়াপীড়ি করায় গুরু ক্রুদ্ধ হইয়া কর্ণের বহির্ভাগে শ্যামবর্ণবিশিষ্ট আটশত শ্বেত অশ্ব চাহিয়া বসিলেন। গালব চন্দ্রবংশীয় রাজা যযাতির নিকট গিয়া বর্ণনানুরূপ অষ্টশত অশ্ব প্রার্থনা করিলেন। রাজা নিজ কন্সা মাধবীকে আনিয়া বলিলেন, "মহর্ষি, আমার ঐরূপ ঘোড়া নাই। আপনি আমার এই কন্সার বিনিময়ে অপর কোন নরপতির নিকট হইতে অশ্ব সংগ্রহ করুন।" মাধবীকে সঙ্গে লইয়া গালব ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি হর্য্যশ্বের নিকট উপস্থিত হন। ঋষির প্রার্থনা শুনিয়া হর্য্যশ্ব বলিলেন, "আপনার প্রার্থনানুরূপ অশ্ব আমার দুই শতের অধিক নাই। ঐ দুই শত অশ্বের

বিনিময়ে এই কন্যাতে আমাকে একটি মাত্র পুত্রোৎপাদন করিতে দিন।” গালব রাজার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া মাধবীকে রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। হর্য্যশ্বের ঔরসে একটি মাত্র পুত্র জন্মিবার পর ঋষি রাজকন্যাকে লইতে আসিলেন। মাধবীও কুমারী হইয়া ঋষির অনুগমন করিল। অতঃপর তাঁহারা কাশীরাজ দিবোদাসের নিকট উপস্থিত হইলেন। দিবোদাসেরও মাত্র দুই শত শ্যামকর্ণ ও শুভ্রবর্ণ বিশিষ্ট অশ্ব ছিল। তিনিও মাধবীর গর্ভে একটি মাত্র পুত্রলাভ করিবার বিনিময়ে অশ্বগুলি গালবকে দিতে চাহিলেন। দিবোদাসের ঔরসে পুত্র জন্মিবার পর কুমারী মাধবীকে লইয়া গালব ঋষি ভোজনগরপতি উশীনরের নিকট গেলেন। এই রাজাও অনুরূপভাবে দুই শত অশ্ব বিনিময়ে মাধবীর গর্ভে একটি পুত্র উৎপাদন করিলেন। এইরূপে গালবের ছয়শত অশ্ব সংগৃহীত হইল; কিন্তু অবশিষ্ট দুই শত কিছুতেই সংগ্রহ করা গেল না। তখন গালব অশ্ব ও কন্যাসহ বিশ্বামিত্রের নিকট গিয়া বলিলেন, “গুরুদেব, দক্ষিণার তিন চতুর্থাংশ মাত্র সংগৃহীত হইয়াছে। অবশিষ্টাংশের জন্য এই কন্যাটিকে প্রতিগ্রহ করিয়া ইহার গর্ভে একটি পুত্র উৎপাদন করুন।” বিশ্বামিত্র সানন্দে সম্মত হইলেন। তিনি কহিলেন, “গালব, তুমি প্রথমেই কন্যাটিকে আমার কাছে আনয়ন কর নাই কেন? আহা, তা হইলে ইহার গর্ভজাত ঐ তিনটি পুত্রও আমারই হইত।” বিশ্বামিত্রের ঔরসে পুত্র জন্মিবার পর গালব মাধবীকে তাহার পিতা যযাতির নিকট রাখিয়া আসিলেন। উদ্ধৃত কাহিনী হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, প্রাচীন ভারতে অন্ততঃ স্থান ও যুগ বিশেষে দারগ্রহণ এবং পুত্রলাভের ব্যবস্থা আধুনিক কালের ন্যায় সুনিয়ন্ত্রিত ছিল না। এই সিদ্ধান্তের সমর্থক আরও বহু প্রমাণ আছে। গৌতমীপুত্র সাতকর্ণি (১০৬-৩০ খ্রী°) প্রভৃতি অসংখ্য রাজার নামের সহিত মাতৃগোত্রের উল্লেখ, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের (৩৭৬-৪১৪ খ্রী°) কন্যা এবং বাকাটক বংশীয় ব্রাহ্মণরাজা দ্বিতীয় রুদ্রসেনের অগ্রমহিষী প্রভাবতীগুপ্তা কর্তৃক স্বনামের পিতৃবংশজ্ঞাপক “গুপ্তা” শব্দের ব্যবহার এবং পিতৃগোত্রানুসারে ধারণসগোত্রা বলিয়া আপনার

পরিচয়দান, ইত্যাদি অনেকগুলি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত হইতে জানা যায় যে, প্রাচীন ভারতে সাধারণতঃ বিবাহিতা নারীর গোত্রান্তর ঘটিত না। সম্ভবতঃ তৎকালে প্রদানাভাবমূলক (আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ) বিবাহের জনপ্রিয়তাই ইহার কারণ। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণের নামের সহিত তাঁহাদের মাতৃগোত্রের উল্লেখ দেখা যায়। মনু-সংহিতা (৯।১৫৯ ৬০) প্রভৃতি গ্রন্থে সমাজকর্তৃক স্বীকৃত যে দ্বাদশ প্রকার (ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্তক, কৃত্রিম, গূঢ়োৎপন্ন, অপবিদ্ধ, কানীন, সহোঢ়, ক্রীত, পৌনর্ভব, স্বয়ংদত্ত ও শৌদ্র) পুত্রের উল্লেখ আছে, উহাতেও প্রাচীন সমাজে বিবাহের অনিয়ন্ত্রিত অবস্থা সূচিত হয়। আবার অষ্টম শতাব্দীতেও বাংলা দেশে ব্রাহ্মণের শূদ্রাপত্নীগ্রহণ নিন্দিত ছিল না, সামন্ত লোকনাথের ত্রিপুরাশাসন হইতে তাহা জানা যায়। ব্রাহ্মণবংশীয় বীরের পুত্র কেশবকে পারশব (ব্রাহ্মণপিতার শূদ্রাপত্নীজাত পুত্র) বলা হইয়াছে। কিন্তু কেশবের কন্যার ভারদ্বাজগোত্রীয় সদ্ব্রাহ্মণবংশে বিবাহ হইতে দেখা যায়। আবার এই বিবাহোৎপন্ন লোকনাথের সামাজিক মর্যাদা কিছু কম ছিল না। কারণ, তাহা হইলে তিনি স্বীয় তাম্রশাসনে এই পরিচয় প্রকাশ করিতেন না। অবশ্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে, এমন কি ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত, ব্রাহ্মণাদি বিভিন্ন বর্ণের বাঙ্গালীকর্তৃক অজ্ঞাতজাতিকুলশীলা ও পিতৃপরিচয়হীনা "ভরার মেয়ে" (বিবাহেচ্ছু ব্যক্তিগণের নিকট বিক্রয়ার্থ নৌকাযোগে আনীত কন্যাসমূহ) বিবাহ সমাজে প্রচলিত ছিল।

৮২ পৃষ্ঠা।—অশোক যে প্রত্যহ ময়ূরমাংস ভোজন করিতেন, এই সিদ্ধান্ত সন্দেহাতীত নহে। কারণ ময়ূরমাংস ভক্ষণের ব্যবস্থা অধিকাংশ ধর্মশাস্ত্রের বিরোধী। আবার যেমন সংস্কৃত-প্রাকৃতে "মৃগ" শব্দ সাধারণ ভাবে পশু-অর্থে ব্যবহৃত হইত, পালিভাষায় "মোর" (= সংস্কৃত "ময়ূর") শব্দটির ঠিক তদ্রূপ পক্ষিসাধারণ অর্থে প্রয়োগ দেখা যায়। মজ্ঝিমনিকায়ের অন্তর্গত ভয়ভেরবসুত্তের টীকায় একস্থলে বুদ্ধঘোষ লিখিয়াছেন, "'মগো বা আগচ্ছতি।' সব্বচতুপ্পদানং হি ইধ মগো তি

নামং। 'যোরো বা কট্ঠং পাতেতীতি।' যোরগহণেন চ ইধ সব্বপব্বজিত-গহণং অধিপ্পেতং।"

যাহা হউক, উপরের আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে যে, কোন কোন বিষয়ে আমার সহিত স্বর্গীয় অধ্যাপক মহাশয়ের কিছু কিছু মতানৈক্য আছে; কিন্তু উহাতে বর্ত্তমান গ্রন্থের মূল্য কিছুমাত্র কম হয় না। আমার মন্তব্যগুলিকে গ্রন্থের অনুপূরক বা পাদটীকা হিসাবে গ্রহণ করিলে পাঠকেরা প্রাচীন ভারতীয় নানা সামাজিক সমস্যার বিভিন্ন দিক বিচার করিতে পারিবেন। প্রকৃতপক্ষে, বাংলাভাষায় যে-কয়েকখানি ঐতিহাসিক গবেষণামূলক গ্রন্থ আছে, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "মৌর্য্য-যুগের ভারতীয় সমাজ" তন্মধ্যে বিশিষ্ট স্থান লাভ করিবে, সন্দেহ নাই।

পরলোকগত শিক্ষকের অসমাপ্ত গ্রন্থ আমার সাহায্যে প্রকাশিত হইয়াছে, ইহাতেই আমার আনন্দ। পাঠকগণ ইহা পাঠ করিয়া উপকৃত হইলে অধিকতর আনন্দের বিষয় হইবে। আমার দোষে গ্রন্থে যদি কোন ভ্রমপ্রমাদ প্রবেশ করিয়া থাকে, তবে সেজন্য আমি পাঠকগণের নিকট এবং বিশেষ করিয়া স্বর্গীয় গ্রন্থকার মহোদয়ের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা চাহিতেছি।

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস
ও সংস্কৃতি বিভাগ,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
৫ই আগষ্ট, ১৯৪৪

শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার

মৌর্য্যযুগের ভারতীয় সমাজ

অবতরণিকা

এই পুস্তিকায় মৌর্য্যযুগের ও প্রসঙ্গক্রমে মৌর্য্যপূর্ব যুগের ভারতের সামাজিক অবস্থা বিবৃত করাই লেখকের উদ্দেশ্য। উক্ত দুই যুগের সমাজের অবস্থা জানিতে হইলে আমাদিগকে প্রথমতঃ প্রাচীনতম বৌদ্ধ-গ্রন্থগুলি—যেগুলিতে ভগবান্ বুদ্ধ ও তৎসমসাময়িক মনীষিবৃন্দের উক্তি অবিকৃত বা স্বল্প-পরিবর্ত্তিত ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, সেগুলিকে বিশেষ-ভাবে দেখিয়া লইতে হইবে। অতঃপর তৎপরবর্ত্তী মৌর্য্য রাজগণের রাজত্বকালে রচিত গ্রন্থগুলি হইতে সমসাময়িক সামাজিক অবস্থার পর্য্যালোচনা করিতে হইবে। এইরূপ আলোচনা ও তুলনার ফলে, আমরা তৎকালীন সমাজ, সামাজিক আদর্শ ও তত্ত্বত্রয়ের পরিবর্ত্তন এবং উহার মূলীভূত কারণ বুঝিতে পারিব।

যে মৌর্য্যযুগের সামাজিক ইতিহাস আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়, সেই মৌর্য্যযুগ ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি জাতীয় কীর্ত্তি ও প্রাধান্যের যুগ। সে যুগে ভারতবাসী জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, নৈতিক বলে ও বাহুবলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ভারতের ধনৈশ্বর্য্য, সামরিক শক্তি ও নৈতিক বল সকলই বিদেশীর চক্ষে অতুলনীয় বলিয়া বোধ হইত। ভারতবাসীর স্বাধীনচিন্তার স্রোতঃ তখনও রুদ্ধ হয় নাই। ভারতবাসী তখনও পৃথিবীর ক্ষণিকবাদ বা প্রাকৃতিক জগতের মায়াবাদের মোহে উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত হইয়া, আত্মোন্নতির

চিন্তায় জলাঞ্জলি দিয়া, আলস্য ও তমোগুণের জড়তায় আত্মবিসর্জ্জন দেন নাই। ধর্ম্মের নামে নৈষ্কর্ম্ম্য ও সদাচারের নামে রক্ষণশীলতা তখনও দেশে প্রবেশ করে নাই। ভারতীয় মনস্বীর চিন্তাশক্তি তখনও অব্যাহত ছিল এবং দেশের নৈতিক ও মানসিক অবনতির বীজ তখনও রোপিত হয় নাই।

গুণকর্ম্মবিভাগ-মূলক চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজে প্রত্যেক বর্ণই নিজ নিজ কর্ম্মের ও তৎফলে দেশের শ্রীবৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নিজ কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর ছিলেন। ব্রাহ্মণ জ্ঞানবলে বলীয়ান্ হইয়া, মোক্ষচিন্তার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ও দেশের উন্নতির চিন্তায় অনুপ্রাণিত ছিলেন। জাতি-মাত্রোপজীবী ভিক্ষান্নপুষ্ট ব্রাহ্মণের স্থান তখনও দেশে ছিল না। ক্ষাত্র শক্তি তখনও সমাজ ও দেশের রক্ষণকে পরমধর্ম্ম জ্ঞান করিয়া, বিদেশী শত্রুর দমনে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। বৈশ্য ও শূদ্র বার্ত্তা ও কৃষিকার্য্যের দ্বারা সমাজের পুষ্টি ও সেবার জন্য যত্নবান্ ছিলেন। ফলে সমাজের সর্ব্বপ্রকারেই উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। রাজশক্তি (অবশ্য একেবারে প্রজাতন্ত্র না হইলেও) বিদেশী শত্রুর হস্ত হইতে দেশরক্ষা করিয়া, প্রজাবর্গের পালনে যত্নবান্ ছিলেন। প্রজাশক্তিও নিজ কর্ত্তব্য না ভুলিয়া, রাজার নির্দ্দেশানুবর্ত্তী হইয়া, ন্যায় ও ধর্ম্মের রক্ষাকল্পে বদ্ধপরিকর ছিলেন। এই সকল কারণে দেশের অবস্থা ভালই ছিল। নিত্য অভাব, দারিদ্র্য, পরমুখাপেক্ষিত্ব ও বিদেশীর উৎপীড়ন — কিছুই ছিল না।

ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রকারের উৎকর্ষই অক্ষুণ্ণ ছিল। জ্ঞানবল, বাহুবল বা ধনবল—ভারতবাসীর কিছুরই অভাব ছিল না। বিদেশী শত্রু অবাধে ভারতে প্রবেশ করা দূরে থাকুক, ভারতীয় শক্তির নামে ভীত হইতেন। যে যুগের কথা লিখিতেছি, সেই যুগেই প্রবল পরাক্রান্ত বিশ্ববিজয়ী গ্রীকবীর সেকেন্দর শাহ (আলেকজাণ্ডার) মগধ-সম্রাটের অতুল শক্তির কথায় ভীত হইয়া, ভারত-জয়ের আশা ত্যাগ করিয়া ক্ষুব্ধচিত্তে স্বদেশ-প্রত্যাবর্ত্তনে বাধ্য হইয়াছিলেন।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই মৌর্য্যযুগে ভারতের সমাজ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে। মৌর্য্যযুগ বলিতে গেলে সাধারণতঃ ঐতিহাসিকের মতে খৃঃ পূঃ ৩২৫ হইতে খৃঃ পূঃ ১৭৫ অব্দ পর্য্যন্ত সার্দ্ধশতাব্দী কালকে বুঝায়। সামাজিক ইতিহাসের বিষয় আলোচনা করিতে গেলে, মৌর্য্য-সাম্রাজ্য-স্থাপনের কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে এবং মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের অবসানের কিছুকাল পর পর্য্যন্ত সময়ের সমাজের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতে হইবে। কারণ, মৌর্য্য সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহণের সঙ্গে সঙ্গে একটি নূতন সমাজ সহসা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই এবং মৌর্য্য রাজগণের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গেই সেই সমাজ সহসা বিলুপ্ত হয় নাই। প্রসঙ্গক্রমে মৌর্য্যপূর্ব্ব-যুগের সামাজিক বিষয় আলোচনারও বিশেষ প্রয়োজন। কেন না, উক্ত যুগে ধর্ম্ম ও সমাজের উন্নতিকল্পে বুদ্ধ, মহাবীর ও অন্যান্য ধর্ম্মাচার্য্যগণ ও সঙ্ঘ-নায়কেরা নিজ নিজ মত প্রচার করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ ঋষিরাও এ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট থাকেন নাই। তাঁহারাও ধর্ম্ম ও সমাজ বিষয়ে রক্ষণশীলতার পক্ষপাতী ছিলেন না। বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের বিপক্ষে তাঁহারাই সর্ব্বপ্রথমে অভ্যুত্থান করিয়া, উহা অপেক্ষা জ্ঞানের প্রাধান্য স্থাপনে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। সমাজ সম্বন্ধেও তাঁহারা দেশ, কাল, পাত্র ভেদে পরিবর্ত্তনশীলতার পক্ষপাতী ছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন নীতিগুলির সংঘর্ষে সমাজের বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে। এইগুলির আলোচনা বিশেষ প্রয়োজনীয়। তবে দুঃখের বিষয়, সামাজিক ইতিহাসে বৌদ্ধ বা জৈন মহাপুরুষদিগের মত সম্বন্ধে আমরা বিশেষ অনভিজ্ঞ। আবার ঠিক ঐ যুগে রচিত ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থও অতি বিরল। দুই-একখানি যাহা আছে, তাহাদের রচনার কাল লইয়াও বিশেষ মতভেদ আছে। এ অবস্থায় গ্রীক্ ঐতিহাসিকদিগের সমসাময়িক বিবরণই আমাদের একমাত্র ভরসা ছিল।

মৌর্য্যযুগের স্থিতিকাল।

প্রায় ত্রিশ বৎসর হইল, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে; এবং মহীশূর গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক উহা প্রকাশিত ও ইংরাজী ভাষায় অনূদিত

হইয়াছে। এই অর্থশাস্ত্র এক বিরাট্ গ্রন্থ। যে ব্রাহ্মণ রাজনৈতিকের মন্ত্রশক্তি ও প্রতিভাবলে প্রবলপরাক্রান্ত নন্দরাজগণ উৎখাত ও মগধে মৌর্য্যরাজ চন্দ্রগুপ্ত প্রতিষ্ঠিত হন, সেই কৌটিল্য বা চাণক্যই এই গ্রন্থের রচয়িতা।

উপস্থিত ক্ষেত্রে চাণক্য বা কৌটিল্যের পরিচয় বা জীবনী লইয়া আমাদের ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। হিন্দু রাজনীতি ও সাহিত্যে চাণক্যের নামের বহু উল্লেখ আছে ও তাঁহার কূটবুদ্ধির কথা বহু স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে। তবে এক্ষেত্রে প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা বলা যাইতে পারে যে, হিলেব্রাণ্ড-প্রমুখ কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিতের মতে অর্থশাস্ত্র কৌটিল্যের নিজের রচিত নহে, তাঁহার কোন শিষ্য বা প্রশিষ্যের রচিত। তাঁহাদের এরূপ সন্দেহের কারণ এই যে, উক্ত গ্রন্থের বহু স্থানে মতবিশেষের খণ্ডন বা সমর্থনের জন্য কৌটিল্যের নিজের নাম উল্লেখ করিয়া তাঁহার মত উদ্ধৃত হইয়াছে এবং "ইতি কৌটিল্যঃ," "নেতি কৌটিল্যঃ" প্রভৃতি বাক্য ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু স্থির হইল, এই নূতন মতও খণ্ডিত হইয়াছে।

অর্থশাস্ত্রের তিন চারি স্থানে উক্ত গ্রন্থ কৌটিল্যের স্বরচিত বলিয়া লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থারম্ভে ভূমিকায় "কৌটিল্যেন কৃতং শাস্ত্রং বিমুক্তগ্রন্থবিস্তরম্"—এই কথা বলা হইয়াছে। আবার গ্রন্থের মধ্যে এক স্থানে বলা হইয়াছে যে, উক্ত গ্রন্থ "কৌটিল্যেন নরেন্দ্রার্থে" অর্থাৎ কোন লোকপালের উপদেশের জন্য কৌটিল্য কর্ত্তৃক রচিত।* অবশেষে গ্রন্থের উপসংহার স্থলেও উক্ত গ্রন্থ চাণক্যের রচিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে; যথা—

"যেন শাস্ত্রং চ শস্ত্রং চ নন্দরাজগতা চ ভূঃ।
অমর্ষেণোদ্ধৃতান্যাশু তেন শাস্ত্রমিদং কৃতম্।"

* সর্ব্বশাস্ত্রাণ্যনুক্রম্য প্রয়োগমুপলভ্য চ।
কৌটিল্যেন নরেন্দ্রার্থে শাসনস্য বিধিঃ কৃতঃ।—শাসনাধিকারঃ, ৭৫ পৃষ্ঠা।

এতদ্ভিন্ন, গ্রন্থের ভাষা এবং গ্রন্থে বর্ণিত সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা প্রভৃতির পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, গ্রন্থ কৌটিল্যের স্বরচিত এবং কৌটিল্যের সমসাময়িক মৌর্য্যযুগই উহার রচনা-কাল। অর্থশাস্ত্রের সমাজের চিত্রের সহিত গ্রীকদিগের লিখিত ভারতীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক চিত্রের বহু সাদৃশ্য আছে। যথাসময়ে তাহার আলোচনা করা হইবে

প্রথম অধ্যায়

সমাজবিধি, জাতিভেদ

অর্থশাস্ত্রের সমস্ত-নির্দ্দেশের পর, আমরা অর্থশাস্ত্র-বর্ণিত সমাজের আলোচনা করিব। সেই যুগের আর্য্য-সমাজ চাতুর্ব্বর্ণ্যমূলকই ছিল, অর্থাৎ সমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি বর্ণের লোক লইয়া গঠিত ছিল। কিরাতচণ্ডালাদি অন্ত্যজ বর্ণ ও বন্যজাতীয় লোকের স্থান, বোধ হয়, সমাজের মধ্যে ছিল না। কেন-না অর্থশাস্ত্রে দেখা যায় যে, নগরে বা গ্রামের মধ্যে ইহাদিগকে বাস করিতে দেওয়া হইত না—ইহাদের স্থান পল্লীর বাহিরে ছিল (জনপদ-নিবেশ—৪৬ পৃষ্ঠা)। "পাষণ্ডচণ্ডালানাং শ্মশানান্তে বাসঃ।"—(৫৮ পৃষ্ঠা)। প্রাচীনতম বৌদ্ধ-গ্রন্থগুলিতে এবং জাতকেও চণ্ডালেরা ঐরূপ অস্পৃশ্য ও সমাজ বহির্ভূত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ—হিন্দুসমাজের এই চারি বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য অর্থশাস্ত্রে বিশদভাবে বর্ণিত আছে। বহু পূর্ব্বেই উহা স্থাপিত হইয়াছিল। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে বৌদ্ধধর্ম্ম-স্থাপনের সময় ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা ন্যূন ছিল। প্রখ্যাতনামা পালিভাষাবিদ্ ঐতিহাসিক ডাক্তার রিজ্ ডেভিড্স্ তাঁহার Buddhist India বা বৌদ্ধ ভারত গ্রন্থে এই বিষয়ের আলোচনা করিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তিকালে সমাজে, বোধ হয়, ক্ষত্রিয়-প্রাধান্যই ছিল।

এস্থলে এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। তবে এইটুকুমাত্র বলা যাইতে পারে যে, বৌদ্ধযুগের বহু পূর্ব্বেই

ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল। তবে বৌদ্ধধর্ম্ম ও জৈনধর্ম্ম প্রবর্ত্তকেরা ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং তাঁহারা ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য স্বীকার করিতেন না। Rhys Davids মহোদয় কেবলমাত্র বৌদ্ধগ্রন্থালোচনার ফলে যে তথ্যে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত বা যথার্থ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। বৌদ্ধ ও জৈনদিগের মত যাহাই হউক না কেন, হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতেন এবং সামাজিক প্রাধান্য ভিন্ন ব্রাহ্মণের কতকগুলি বিশেষ অধিকার বা পরিহার ছিল। এই পরিহারগুলি হইতে ব্রাহ্মণের প্রকৃত সামাজিক মর্য্যাদা বুঝা যাইবে। অগ্রে আমরা সেইগুলি উল্লেখ করিব। প্রথমতঃ, যে কোন প্রকার অপরাধে অপরাধী হউক না কেন ব্রাহ্মণের প্রাণদণ্ড বা কায়িক দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল না। কৌটিল্য বলেন,—

"সর্ব্বাপরাধেষ্বপীড়নীয়ো ব্রাহ্মণঃ তস্যাভিশস্তাঙ্কো ললাটে স্যাদ্ব্যবহার পতনায়। স্তেয়ে শ্বা। মনুষ্যবধে কবন্ধঃ। গুরুতল্পে ভগম্। সুরাপানে মদ্যধ্বজঃ।

ব্রাহ্মণং পাপকর্ম্মাণমুদ্‌ঘুষ্যাঙ্ককৃতব্রণম্।
কুর্য্যান্নির্ব্বিষয়ং রাজা বাসয়েদাকরেষু বা॥"

—(অঃ শাঃ, ১ সং, ২২০ পৃঃ)।

দোষাশঙ্কায় বা সন্দেহে (suspicion of guilt) ব্রাহ্মণ ও ব্রতশালিদিগের কেবলমাত্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা (করা) করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইত বা বিশেষ অপরাধের স্থল থাকিলে চার-রক্ষিত করিয়া রাখা হইত, অন্য বর্ণের অপরাধীদিগের ন্যায় যন্ত্রণা বা উৎপীড়নাদি দ্বারা দোষ-স্বীকার করিতে বাধ্য করা হইত না কোন রাজকর্ম্মচারী উল্লিখিত নিয়ম লঙ্ঘন করিলে তাঁহাকে দণ্ডভাগী হইতে হইত।

অর্থদণ্ডাদি স্থলেও বিশেষ নিয়ম ও পরিহার ছিল। প্রাচীন সূত্রকার গৌতমের মতে ব্রাহ্মণ চৌর্য্যাপরাধে অপরাধী হইলে, তাঁহাকে শূদ্র অপরাধীর দণ্ডের ৬৪ গুণ অর্থদণ্ড দিতে হইত। অর্থশাস্ত্রে এ নিয়মের

উল্লেখ নাই। তবে কতকগুলি কার্য্য ব্রাহ্মণের বিশেষ অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হইত। যেমন, সুরাপানাদি শূদ্রাদির পক্ষে কোন অপরাধ বলিয়াই গণ্য হইত না, কিন্তু ব্রাহ্মণ সুরাপায়ী হইলে ললাটে চিহ্নিত করিয়া তাঁহাকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করা হইত। অর্থদণ্ডের সম্বন্ধে কৌটিল্য একটি বিশেষ বিধি দেখা যায়। উহা এই যে, যদি কোন ব্রাহ্মণ বা অন্যধর্ম্মাবলম্বী 'পাষণ্ড' তপস্বী অর্থদণ্ডে অশক্ত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা অর্থের বিনিময়ে জপ-তপাদি দ্বারা রাজার মঙ্গলকামনা করিয়া বা উপবাসাদি করিয়া অর্থদণ্ড-দায় হইতে মুক্ত হইতে পারিতেন।

ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ শ্রোত্রিয়, সাধারণতঃ সাক্ষিরূপে আহূত হইতেন না; হইলেও সাক্ষ্যদানকালে বিনা-শপথে বক্তব্য বলিতে পারিতেন। বিচারক ব্রাহ্মণ সাক্ষীকে "ব্রূহি" বলিয়া সাক্ষ্যদানের আদেশ করিতেন।

শ্রোত্রিয় বা বেদপারগ ব্রাহ্মণেরা 'অকর' ছিলেন, অর্থাৎ তাঁহাদিগকে কোন প্রকার কর দিতে হইত না। অর্থশাস্ত্রে ব্রাহ্মণমাত্রেরই কর-রাহিত্যের উল্লেখ নাই। তবে বিদ্বান্ শ্রোত্রিয়দিগকে নিষ্কর ভূমি-দানের উল্লেখ আছে। এই সমস্ত ভূমি 'ব্রহ্মদেয়' বলিয়া পরিগণিত হইত এবং সর্ব্বপ্রকারে কর-রহিত ছিল। অতি প্রাচীনতম বৌদ্ধগ্রন্থে এই সকল ব্রহ্মদেয় ভূমির উল্লেখ পাওয়া যায়। 'দীঘনিকায়' গ্রন্থে কতিপয় সূত্রে আমরা ব্রহ্মদেয়ভোগী মহাশাল ব্রাহ্মণদিগের ও ক্ষত্রিয়দিগের উল্লেখ পাইয়া থাকি।* এই মহাশালগণ কোন প্রকার কর দান করিতেন না এবং ইহা ভিন্ন তাঁহাদের অন্যান্য বিশিষ্ট অধিকার ছিল।

ব্রাহ্মণমাত্রেরই অকরত্ব-সম্বন্ধে, ধর্ম্মসূত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদিতে মতভেদ দৃষ্ট হয়। আপস্তম্ব ও বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্রে "অকরঃ শ্রোত্রিয়ঃ" এই

* মহাশাল শব্দ অতি প্রাচীন। উপনিষদে উহার উল্লেখ আছে। টীকাকার, মহাশাল শব্দের 'মহাগৃহস্থ' এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

সূত্রটি হইতে কেবলমাত্র শোত্রিয়ই অকর ছিলেন বলিয়া বুঝা যায়। কিন্তু বশিষ্ঠ-ধর্ম্ম-শাস্ত্রের মতে ব্রাহ্মণমাত্রেই অকর ছিলেন। বশিষ্ঠ বলেন,—

"রাজা তু ধর্ম্মেণানুশাসন্ ষষ্ঠমংশং হরেদ্ধনস্য, অন্যত্র ব্রাহ্মণাৎ। ইষ্টাপূর্ত্তস্য তু ষষ্ঠমংশং ভজতি। ব্রাহ্মণো বেদমাঢ্যং করোতি, ব্রাহ্মণ আপদ উদ্ধরতি। তস্মাদ্ ব্রাহ্মণোঽনাদ্যঃ -সোমোঽস্য রাজা ভবতি।"

অর্থশাস্ত্রে ব্রাহ্মণমাত্রের অকরত্বের উল্লেখ নাই। শ্রোত্রিয়দিগের কথাই বিশেষভাবে লিখিত হইয়াছে। কর রাহিত্য ভিন্ন তাঁহাদিগের অন্যান্য অধিকারও ছিল। তাঁহারা বিনা-শুল্কে লবণ পাইতেন। (শ্রোত্রিয়াস্তপস্বিনো বিষ্টয়শ্চ ভক্তলবণং হরেয়ুঃ। অঃ শাঃ, ৮৪ পৃষ্ঠা)। যজ্ঞ, উপবীত, চৌল প্রভৃতি কার্য্যের জন্য অন্য জনসাধারণের ন্যায় তাঁহাদের দ্রব্য-সম্ভারের উপর শুল্ক লওয়া হইত না। (কৌ, ১১১—বৈবাহিকমন্বায়নমৌপযানিকং যজ্ঞকৃত্যপ্রসবনৈমিত্তিকং দেবেজ্যাচৌলোপনয়নগোদানব্রতদীক্ষণাদিষু ক্রিয়াবিশেষেষু ভাণ্ডমুচ্ছুল্কং গচ্ছেৎ।) তাঁহারা রাজার ক্ষেত্র হইতে যজ্ঞার্থ বা দেবকার্য্যার্থ পুষ্প, ফল, শস্যাদি বিনামূল্যে আহরণ করিতে পারিতেন। শ্রোত্রিয় ও ব্রাহ্মণমাত্রেই বিনা শুল্কে নদী পার হইতে পারিতেন।

উপরোক্তগুলি ভিন্ন ব্রাহ্মণের, বিশেষতঃ শ্রোত্রিয়দিগের আরও কতকগুলি অধিকার ছিল। নিম্নে তাহা লিখিত হইল:—

১। উত্তরাধিকারিহীন শ্রোত্রিয়-সম্পত্তিতে রাজার অধিকার ছিল না। অন্য বর্ণের সম্পত্তি হইলে, উহা রাজকোষে গৃহীত হইত। "অদায়াদকং রাজা হরেৎ, স্ত্রীবৃত্তিপ্রেতকার্য্যবর্জ্জম—অন্যত্র শ্রোত্রিয়দ্রব্যাৎ। তৎ ত্রৈবিদ্যেভ্যঃ প্রযচ্ছেৎ।"—উক্ত সম্পত্তি বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণকেই প্রদত্ত হইত। ধর্ম্মসূত্রগুলিতেও ঐ বিধি দেখা যায়।

২। অন্য কেহ বলপূর্ব্বক বা অন্য কারণবশতঃ শ্রোত্রিয়-সম্পত্তি অধিকার করিয়া বহুদিন নিজ বশে রাখিলে, অন্য বর্ণের লোকের সম্পত্তির ন্যায় শ্রোত্রিয় দ্রব্যে ভোগজনিত অধিকার (right by adverse

possession or prescriptive right) বা স্বত্ব জন্মিত না।
—১৯১ পৃষ্ঠা।

"উপনিধিমাধিং নিধিং নিক্ষেপং স্ত্রিয়ম্
সীমানং রাজঃশ্রোত্রিয়দ্রব্যাণি চ।"

৩। যুদ্ধে বিজিত রাজ্যে রাজা, ব্রাহ্মণ বা শ্রোত্রিয়-দ্রব্য যথেচ্ছ ভোগ করিতে পারিতেন না। তাঁহাদিগকে উহা প্রত্যর্পণ করা হইত।

মৌর্য্যযুগে ব্রাহ্মণের, বিশেষতঃ শ্রোত্রিয়দিগের, বিশেষ অধিকার-সম্বন্ধে উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা হইতে ব্রাহ্মণের সামাজিক প্রাধান্য বুঝা যাইবে। ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য বহু পূর্ব্বেই স্থাপিত হইয়াছিল এবং বৌদ্ধজৈনাদি ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীদিগের চক্ষে উহা বিসদৃশ বলিয়া বোধ হইত। বৌদ্ধধর্ম্ম- ও জৈনধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠাতা ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম-প্রচারকগণ ব্রাহ্মণ প্রাধান্য স্বীকার করা দূরে থাকুক, ক্ষত্রিয়গণকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেন। জাত্যভিমান ও স্ব স্ব জাতির প্রাধান্য-স্থাপনের চেষ্টা কেবল ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেই ছিল না। প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈনগ্রন্থালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, স্বয়ং তথাগত বুদ্ধও জাত্যভিমানবিবর্জ্জিত ছিলেন না এবং দীঘনিকায়ের অন্তর্গত অম্বট্ঠ সুত্তে অম্বট্ঠ নামক এক ব্রাহ্মণের সহিত কথোপকথনব্যপদেশে তিনি ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্য-স্থাপন করিতে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। ঐরূপ অন্য দুই চারিটি সুত্তে দেখা যায় যে, তিনি সকল বর্ণেরই সমানত্ব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং প্রসঙ্গক্রমে ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্মের উৎকর্ষ, গুণ বা জ্ঞান-প্রাধান্যই যে প্রকৃত ব্রাহ্মণত্বের চিহ্ন, তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। অন্য দুই এক স্থলে আবার ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় যে অন্য বর্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এ কথাও বুদ্ধ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। (কন্নকত্থালসুত্ত)।

ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী জৈনেরাও ব্রাহ্মণের নিকৃষ্টত্ব প্রমাণ করিবার অবসর পাইলে ছাড়িতেন না। কল্পসূত্রগ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, জৈনধর্ম্মের অন্যতম প্রবর্ত্তক মহাবীর, ব্রাহ্মণী দেবনন্দার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন;

কিন্তু পাছে এ হেন মহতের নিকৃষ্ট গর্ভে উৎপত্তি হয়, এই ভাবিয়া দেবরাজ শক্র (ইন্দ্র) শুভক্ষণে অতি সন্তর্পণে গিয়া ব্রাহ্মণীর গর্ভ হইতে ভ্রূণকে গ্রহণ করিয়া, বৈশালীর গণরাজকুমারী ত্রিশলার গর্ভে উহা স্থাপন করেন।

ফলতঃ, নিরপেক্ষভাবে ব্রাহ্মণ, জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থগুলি আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যদিও বৈদিক যুগেই ব্রাহ্মণের প্রাধান্যের মূলভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল, এবং এ কথা বারংবার উক্ত হইয়াছে, তথাপি উহা একদিনে স্থাপিত ও অন্য বর্ণ, বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়গণ কর্তৃক অনুমোদিত ও গৃহীত হয় নাই। অতি প্রাচীন যুগে দ্বিজাতি মাত্রেই বেদচর্চা ও নানা যজ্ঞাদির অনুশীলনে যত্নবান্ ছিলেন। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদিগের মধ্যে অনেক ক্ষত্রিয়, কতিপয় বৈশ্য ও অন্যূন একজন শূদ্রের নাম দেখা যায়। ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদির মধ্যে, শাস্ত্রজ্ঞানী আধ্যাত্মচিন্তাপরায়ণ ব্যক্তি বা মুনিদিগের অভাব ছিল না। ক্ষত্রিয়কুলে অনেক ধীমান্ দার্শনিকের জন্ম হইয়াছিল এবং সময়ে অনেক ব্রাহ্মণও এই সকল রাজর্ষির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এতদ্ভিন্ন, অসবর্ণ বিবাহের প্রচলন থাকায়, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণগণের সহিত অনেক ঋষি বংশের আদান প্রদানও চলিত। ফলে উভয়ের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ ও নিকট ছিল।

কালক্রমে নানা কারণে উভয় বর্ণের মধ্যে মনোবিবাদের সূচনা হইয়াছিল এবং এই সকল মনোবিবাদের ফলে উভয়ের মধ্যে ভীষণ সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্ব, আদিপর্ব্ব ও অনুশাসন পর্ব্বের নানা স্থানে পুনঃপুনঃ এই সকল সংঘর্ষের কথা বারংবার উল্লিখিত হইয়াছে।

আদিপর্ব্বের একস্থলে (আদিপর্ব্ব, ১৭৮ অধ্যায়) এই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় যুদ্ধের মূল কারণের কথা বিস্তৃতভাবে লিখিত আছে। উক্ত অধ্যায়ের উপাখ্যানটিতে বর্ণিত আছে যে, কৃতবীর্য্য-সন্তানেরা ভৃগুবংশীয়দিগের সঞ্চিত ধন আত্মসাৎ করিতে উদ্যত হইলে, উভয় পক্ষে বিরোধ

উপস্থিত হয় এবং ভৃগুবংশীয়দিগের তিরস্কারের ফলে ক্ষত্রিয়গণ সবংশে ব্রাহ্মণদিগকে বধ করেন। সমগ্র ভৃগুবংশ তাঁহাদের হস্তে বিনষ্ট হয়; কেবল একটি ভার্গব রমণী অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করেন; কালক্রমে তাঁহার গর্ভে মহর্ষি ঔর্ব্বের জন্ম হয়।* ঔর্ব্বের পর ভৃগুকুলে জমদগ্নি ও তৎপুত্র পরশুরামের জন্ম হয়। পরশুরাম একুশ বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেন বলিয়া পুরাণাদিতে উপাখ্যান আছে। তাহা হইতেই তৎকালে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পরস্পরের প্রতি শত্রুতা বুঝা যায়।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে এই যুদ্ধ বহুকাল ধরিয়া চলিতে থাকে, তৎকালের ব্রাহ্মণেরা ধনুর্বিদ্যা বা যুদ্ধবিদ্যায়ও হীন ছিলেন না এবং এই যুদ্ধে তাঁহারা অন্য বর্ণের সাহায্য প্রাপ্ত হন বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ উদ্যোগপর্ব্বের এক স্থানে ব্রাহ্মণগণ যে বৈশ্যশূদ্রাদির নেতৃত্ব লাভ করিয়া, তাহাদের সাহায্যে ক্ষত্রিয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিতেন, তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। ক্ষত্রিয়েরাও বহুকালব্যাপী যুদ্ধের ফলে হীনবল হইয়া পড়েন এবং কালক্রমে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য স্বীকার করিতে বাধ্য হন। যাহা হউক, অর্থশাস্ত্রের সময় ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য স্থাপিত ছিল। অর্থশাস্ত্রে তাঁহাদের যে কতকগুলি বিশেষ অধিকারের উল্লেখ দেখা যায়, সেগুলি পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

* ততো মহীতলং তাত ক্ষত্রিয়েণ যদৃচ্ছয়া।
খনতাধিগতং বিত্তং কেনচিদ্ ভৃগুবেশ্মনি।
তদ্বিত্তং দদৃশুঃ সর্ব্বে সমেতাঃ ক্ষত্রিয়র্ষভাঃ।
অবমন্য ততঃ ক্রোধাদ্ ভৃগূংস্তান্ শরণাগতান্।
নিজঘ্নুঃ পরমেষ্বাসাঃ সর্ব্বাংস্তান্ নিশিতৈঃ শরৈঃ।
আগর্ভাদনুকৃন্তন্তশ্চেরুঃ সর্ব্বাং বসুন্ধরাম্।
তত উচ্ছিদ্যমানেষু ভৃগুষ্বেবং ভয়াৎ তদা।
ভৃগুপত্ন্যো গিরিং দুর্গং হিমবন্তং প্রপেদিরে।
তাসামন্যতমা গর্ভং ভয়াদ্দধ্রে মহৌজসম্। ইত্যাদি
—মহাভারত, আদিপর্ব্ব—১৭৮ অধ্যায়।

ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের পর ক্ষত্রিয়দিগের কথা। ক্ষত্রিয়েরাও সমাজে ব্রাহ্মণদিগের নিম্নে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিতেন। অর্থশাস্ত্রে ক্ষত্রিয়দিগের স্বধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যের বিশেষ উল্লেখ দেখা যায় এবং তাঁহাদের কতকগুলি অধিকারের উল্লেখ আছে। তাঁহাদের সামাজিক স্থান ঠিক ব্রাহ্মণের নিম্নে হওয়ায়, অর্থদণ্ডস্থলে তাঁহাদিগকে অন্য বর্ণাপেক্ষা অল্প দিতে হইত। বাক্‌পারুষ্য স্থলে ক্ষত্রিয়কে অবমাননা করিলে বৈশ্য শূদ্রাদি অপেক্ষা অধিকতর দণ্ড দিতে হইত। ক্ষত্রিয়কে দাসরূপে বিক্রয় করিলে অপরাধীকে তিন গুণ অর্থদণ্ড দিতে হইত। এইরূপ সামাজিক মর্য্যাদা-হিসাবে আইনের চক্ষে ক্ষত্রিয়ের স্থান ব্রাহ্মণের নিম্নেই ছিল। ক্ষত্রিয়া রমণীর বিবাহ বা পুনর্ব্বিবাহ বিষয়েও বিশেষ বিধি ছিল। কৌটিল্য যোদ্ধৃবর্গের মধ্যে ক্ষত্রিয়বলের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্রাহ্মণাপেক্ষা "প্রহরণবিদ্যাবিনীতং তু ক্ষত্রিয়বলং শ্রেয়ঃ"—অর্থাৎ প্রহরণবিদ্যাকুশল ক্ষত্রিয় সৈন্যই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট—(৩৪০ পৃষ্ঠা)।

উপরোক্ত বিষয়গুলি ভিন্ন অর্থশাস্ত্রে ক্ষত্রিয়দিগের সম্বন্ধে আর বিশেষ উল্লেখ নাই। ইহার কারণস্বরূপ এই কথা বলা যাইতে পারে যে, মৌর্য্যযুগ ক্ষত্রিয়শক্তির অবসান বা অবসানের সময়। ভারতযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষত্রিয়শক্তি একেবারে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। কালক্রমে অবশিষ্ট ক্ষত্রিয়-রাজগণের অধিকার ও প্রাধান্য ক্রমে হ্রাস হইতে থাকে এবং ক্ষত্রিয়েতর রাজগণের প্রাধান্য বাড়িতে থাকে। বুদ্ধের সময় দেখা যায় যে, ক্ষত্রিয়ত্বাভিমানী শাক্যেরা কোশলরাজ ও মগধরাজকে উচ্চকুলোদ্ভব ক্ষত্রিয় বলিয়া গণ্য করিতেন না এবং তাঁহাদের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে কুণ্ঠিত হইতেন। বৌদ্ধগ্রন্থ হইতেও জানা যায় যে, কোশলরাজ প্রসেনজিৎ শাক্যরাজকুমারীর পাণিপ্রার্থী হইলে, তাঁহাকে এক দাসীগর্ভজাতা কুমারী সমর্পণ করা হয়। এই শাক্যবংশীয় দাসীগর্ভজাতা রাজকন্যার গর্ভে পরিণামে প্রসেনজিতের বিরূঢ়ভ নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। মাতুলালয়ে অবমানিত হইয়া, উহার কারণ

জিজ্ঞাসা করিলে, মাতার জন্মবৃত্তান্ত অবগত হইয়া, ইনি ক্রোধে সমস্ত শাক্যবংশের উচ্ছেদসাধন করেন। ইহার কিছুকাল পরে মগধে শিশুনাগবংশের অবসান হয় এবং শিশুনাগবংশীয় শেষ রাজার শূদ্রাপত্নী-গর্ভজাত পুত্র মহাপদ্ম নন্দ মগধের সাম্রাজ্য লাভ করেন। বিষ্ণুপুরাণে এই মহাপদ্ম-নন্দ "পরশুরাম ইব দ্বিতীয়ক্ষত্রিয়ান্তকারী" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন এবং উক্ত পুরাণের মতে অতঃপর শূদ্র ভূপালদিগের রাজত্ব হইবে, এই কথা উল্লিখিত হইয়াছে। নন্দেরা শূদ্রাগর্ভজাত ও ক্ষত্রিয়-দ্বেষী ছিলেন। তাঁহারা ঠিক শূদ্র বলিয়া পরিগণিত হইতেন কি না, তাহা ঠিক বুঝা যায় না। বোধ হয়, শূদ্রাগর্ভজাত বলিয়া অন্য ক্ষত্রিয়-দিগের উপহাসাস্পদ হওয়ায়, তাঁহারা অনেক ক্ষত্রিয়বংশের উচ্ছেদ করেন। কিন্তু নিজেরা, বোধ হয়, আভিজাত্যের দাবী করিতে ছাড়িতেন না। মুদ্রারাক্ষসে নন্দরাজকে উচ্চবংশীয় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থ নন্দ বা মৌর্য্যদিগের সময়ে রচিত না হইলেও, বোধ হয়, গ্রন্থকার তাঁহার সময়ে প্রচলিত কোন ইতিবৃত্ত বা কিংবদন্তী হইতেও ঐরূপ সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থের ষষ্ঠ অঙ্কে মন্ত্রিপ্রবর রাক্ষস উচ্চকুলসম্ভূত নন্দরাজকে ত্যাগ করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে আশ্রয় করায়, লক্ষ্মীকে নীচগামিনী কুলটা বলিয়া তিরস্কার করিয়াছেন। যথা,—

> "পৃথিবীং ত্যক্ত্বা দেবং ভুবনপতিমুচ্চৈরভিজনং
> গতা ছিদ্রেণ শ্রীর্বৃষলমবিনীতেব বৃষলী।"

আর এক স্থলেও ঐরূপ রাক্ষস, মৌর্য্যকে নীচ ও কুলহীন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন,—

> "পৃথিব্যাং কিং দগ্ধাঃ প্রথিতকুলজা ভূমিপতয়ঃ
> পতিং পাপে মৌর্য্যং যদসি কুলহীনং বৃতবতী।" ২য় অঙ্ক, ৭।

এই সকল হইতে নন্দবংশীয়গণকে উচ্চবংশজ বা ক্ষত্রিয় বলিয়া বোধ হয়।

এই নন্দবংশীয় কোনও রাজপুত্রের দাসীগর্ভে মৌর্য্যরাজ চন্দ্রগুপ্তের জন্ম। মৌর্য্যবংশীয়দিগের শূদ্রত্ব-সম্বন্ধে সকল গ্রন্থকারই একমত। তবে বৌদ্ধদিগের মতে চন্দ্রগুপ্ত পিপ্পলীবনের মোরিয়াদের বংশধর এবং এইজন্যই মৌর্য্য নামে অভিহিত। শূদ্র-রাজদিগের আধিপত্যকালে ক্ষত্রিয়দিগের যে প্রাধান্য হ্রাস হইবে, তাহা বুঝা যায়। চন্দ্রগুপ্তের সময় সমস্ত উত্তর ভারত মৌর্য্যরাজগণের অধীন ছিল। তাঁহার সময়ে কোন ক্ষত্রিয় রাজা বা রাজবংশের উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে অর্থশাস্ত্রের সঙ্ঘবৃত্তাধ্যায়ে কম্বোজ ও সুরাষ্ট্রদেশবাসী ক্ষত্রিয়শ্রেণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহারা বার্ত্তা-শস্ত্রোপজীবিনঃ, অর্থাৎ পশুপালন, কৃষিকার্য্য, বাণিজ্য ও অস্ত্র-ব্যবসায়ের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। উক্ত অধ্যায়ে লিচ্ছিবিক, বৃজিক, মল্ল, মদ্র, কুকুর ও পাঞ্চালবংশীয় ক্ষত্রিয়দিগের উল্লেখ আছে। অর্থশাস্ত্রের সময় ইহারা রাজশব্দোপজীবী অর্থাৎ প্রজাদিগের দ্বারা নির্ব্বাচিত গণরাজদিগের অধীন ছিলেন। এই কয়টি কথা ভিন্ন ক্ষত্রিয়দিগের সম্বন্ধে আমরা আর বিশেষ কিছু জানিতে পারি না। মৌর্য্যরাজগণের সময় এই সকল ক্ষত্রিয়শ্রেণী বিশেষ ক্ষমতাপন্ন ছিল বলিয়া বোধ হয় না।

বৈশ্য। অতঃপর বৈশ্যদিগের কথা। বৈশ্যেরা কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন প্রভৃতি কার্য্যের দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। বুদ্ধের জীবন-সময়ে ও মৌর্য্যযুগের অব্যবহিত পূর্ব্বে বৈশ্যশ্রেষ্ঠী বা মহাজন-দিগের অবস্থা অতিশয় উন্নত ছিল। প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে এই সকল কোটিপতি বণিকের অতুল ঐশ্বর্য্যের কথা বর্ণিত আছে এবং তাঁহাদিগের দানের কথা বহু স্থানে উল্লিখিত আছে। ইহা হইতেই মনে করা যায় যে, মৌর্য্যযুগেও ইহাদিগের অবস্থা মন্দ ছিল না। তবে অর্থশাস্ত্র ও অন্য কতিপয় সমসাময়িক গ্রন্থ হইতে বুঝা যায় যে, নানা কারণে ইহারা রাজা ও প্রজা উভয়েরই বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। বোধ হয়, দেশের অধিকাংশ মূলধন

ইহাদিগের হস্তগত হওয়ায় এবং ইহারা ইচ্ছামত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করায়, প্রজাসাধারণের পক্ষে বিশেষ কষ্টকর হইয়াছিল এবং ইহারই ফলে মৌর্য্য রাজগণের সময় বণিক্‌দিগের দমনের জন্য অনেকগুলি কঠোর আইনের সৃষ্টি হইয়াছিল। অর্থশাস্ত্রকার কৌটিল্য বণিক্‌দিগকে "চোরান্ অচোরাখ্যান্" অর্থাৎ 'অচোর সাধুর বেশে প্রজাদিগের সর্ব্বস্বাপহারী' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থশাস্ত্রে বণিক্‌দিগের অতিরিক্ত লাভ গ্রহণ দূষণীয় ছিল (স্থলমপি চ লাভং প্রজানামৌপঘাতিকং বারয়েৎ---৯৮ পৃষ্ঠা) এবং পাছে তাঁহারা অতিরিক্ত মূল্য বৃদ্ধি করিয়া প্রজাদিগকে উৎপীড়িত করেন, এই জন্য রাজ-কর্ম্মচারীরা পণ্যের ক্রয়মূল্যের উপর লাভের অংশ নির্ণয় করিয়া বিক্রয়-মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিতেন। বর্ত্তমানে ব্যবসায়ীদিগের অত্যাচারের ফলে অন্নবস্ত্রাদির মহার্ঘতার জন্য আমাদের দেশের যেরূপ শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে এইরূপ কোন ব্যবস্থা থাকিলে বিশেষ ভাল হইত এবং দারিদ্র্য- ও অভাব জনিত অনেক অশান্তিই নিবারিত হইত। মোটের উপর মনে হয়, বণিক্‌দিগের আর্থিক অবস্থা মন্দ ছিল না। সমাজে ও আইনের চক্ষে ইহাদিগের স্থান ক্ষত্রিয়দিগের নিম্নেই ছিল।

শূদ্র আর্য্য সমাজের সর্ব্বনিম্নে ছিল শূদ্রদিগের স্থান। অর্থশাস্ত্রের এক স্থলে শূদ্রদিগকেও আর্য্য বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। বৈদিক সাহিত্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ভিন্ন বৈশ্যেরাও আর্য্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। শূদ্রেরা সাধারণতঃ কৃষি ও কারুকার্য্যের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহাদিগের অবস্থাও ভাল ছিল। চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজে সাম্যবাদের অভাবের ফলে যদিও তাঁহারা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের ন্যায় বিশেষ অধিকারে বঞ্চিত এবং আইনতঃ অপরাধ স্থলে কঠোরতর দণ্ডে দণ্ডিত হইতেন, তথাপি তাঁহাদের আর্থিক ও নৈতিক অবস্থা মন্দ ছিল না, এবং যদিও দণ্ড-সমতা ও ব্যবহার-সমতার অভাবে সময়ে সময়ে তাঁহাদিগকে যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত, তথাপি বিবাহ বিধি, দায়-বিভাগ, দ্রব্যাদির ক্রয়-বিক্রয় প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহাদিগের

বিশেষ কোন নৈতিক বাধা (disqualification) ছিল না। অন্য বর্ণের ন্যায় তাঁহারা যথেচ্ছ পণ্যদ্রব্যাদির ক্রয়-বিক্রয় করিতে পারিতেন, বৃত্তির জন্য দেশের এক স্থান হইতে অন্য আর এক স্থানে গমন করিতে পারিতেন এবং ইচ্ছামত বেতনের চুক্তি করিয়া কার্য্য গ্রহণ করিতে পারিতেন। তাঁহাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন না বা তাঁহাদিগকে ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারিতেন না। অর্থশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শূদ্রপ্রায় জনসাধারণের (masses) প্রতি কৌটিল্যের বিশেষ সহানুভূতি ছিল এবং ইহাদিগের রক্ষা ও উন্নতিকল্পে কৌটিল্যের প্রবর্ত্তিত শাসন-প্রণালী অনুযায়ী রাজকর্ম্মচারীরা বিশেষ যত্নবান্ হইতেন। নূতন গ্রাম বা নগর স্থাপিত হইলে শূদ্রদিগকে আহ্বান করিয়া চাষের জন্য জমি দেওয়া হইত এবং রাজকোষ হইতে বীজ-ধান্য ও কিছু টাকা অগ্রিম দেওয়া হইত। মহাজনদিগের হস্ত হইতে রক্ষার জন্য সুদের হার সরকার হইতে নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হইত এবং কৃষিকার্য্য বা শস্যসংগ্রহের সময়ে যাহাতে ইহাদিগকে ঋণদায়ে বা অন্য কোন অপরাধবশতঃ কারাদণ্ডে দণ্ডিত না হইতে হয়, তাহারও বিশেষ বিধি ছিল।

ভূমিহীন শূদ্রদিগের অনেকে অন্যের চাকুরী করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে ইহাদিগের কথা উল্লিখিত হইবে। কর্ম্মকার, কারু ও শিল্পজীবীদিগের অধিকাংশই নিজ নিজ শ্রেণী বা গণের নিয়মানুযায়ী হইয়া থাকিত। এই সকল শ্রেণীর কথা পরে বর্ণিত হইবে। শ্রেণীগুলি নির্ব্বাচিত গণমুখ্য বা শ্রেণীমুখ্য দ্বারা পরিচালিত হইত। প্রত্যেক শ্রেণীই নিজ নিজ সুবিধার জন্য কতকগুলি নিয়ম (regulations) প্রবর্ত্তিত করিতে পারিত। শ্রেণীর সভ্যদিগের মধ্যে কোন কারণে মনোবিবাদ উপস্থিত হইলে শ্রেণীমুখ্যেরা উহার বিচার করিতেন এবং অপরাধীদিগকে অর্থদণ্ড বা অন্য কোন দণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারিতেন। অর্থশাস্ত্রের সময়ে তন্তুবায়, সূত্রধর, মণিকার, ধাতুদ্রব্য নির্ম্মাতা, কুশীলব, কৃষক প্রভৃতি সকলেই নিজ নিজ শ্রেণীভুক্ত ছিল।

মৌর্য্যযুগে এই সকল শ্রেণীর পরিচালনের জন্য কয়েকজন রাজকর্ম্মচারী লইয়া (মূলে অমাত্য বা প্রদেষ্টা) একটি সমিতি গঠিত ও স্থাপিত হইয়াছিল। বোধ হয়, পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে শ্রেণীদিগের যে প্রাধান্য ও ক্ষমতা ছিল, তাহা কিছু খর্ব্ব করিবার জন্যই এই রাজ-নিযুক্ত সমিতির প্রবর্ত্তন হয়।

উপরিলিখিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ভিন্ন দেশে চণ্ডালাদি অন্ত্যজ জাতি এবং কিরাতাদি নানা প্রকার বন্যজাতীয় লোক ও ম্লেচ্ছদিগেরও বাস ছিল। ইহারা চাতুর্ব্বর্ণ্য আর্য্য-সমাজের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য হইত না। কৌটিল্য ইহাদের সমাজে স্থান দিয়াছেন কিন্তু সাধারণতঃ লোকালয়ের বাহিরে ইহাদের বাস ছিল। গ্রাম ও নগরাদির বর্ণনা-প্রসঙ্গে ইহাদের সম্বন্ধে আরও কিছু বলা হইবে।

দাসত্ব প্রথা—অতঃপর এখানে প্রসঙ্গক্রমে দাসদের কথা বলা হইবে। ইহারা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অভাববশতঃ কোন বর্ণ বা জাতিবিশেষের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ইহারা স্বতন্ত্রভাবে পরিগণিত হইত।

দাস ও দাসত্ব-প্রথা।

অতি প্রাচীন কালে অর্থাৎ বৈদিক যুগেই আর্য্য সমাজে দাসদিগের উল্লেখ দেখা যায়। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন যে, বিজিত অনার্য্যগণই দাসরূপে হিন্দুসমাজে গৃহীত হয়। এ মতটি কত দূর সত্য, তাহা বলা যায় না। কেন না, প্রাচীন রোমক, গ্রীক্ ও টিউটন-সমাজে ও অন্যান্য প্রাচীন সমাজমাত্রেই দাসত্ব-প্রথার প্রচলন দেখা যায়। ঐ সকল সমাজে সাধারণতঃ বিজিত শত্রুকেই দাসরূপে কার্য্যে নিয়োজিত করা হইত। আবার টিউটন প্রভৃতিদিগের মধ্যে গুরুতর অপরাধেও লোকের স্বাধীনতা হরণ করিয়া, তাহাকে দাসে পরিণত করা হইত। কালক্রমে আবার দারিদ্র্যের পীড়নে অনেক লোক আত্ম-স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়া পরের দাসত্ব স্বীকার করিত। কার্থেজিনীয়ান, ফিনিশীয়ান ও অন্যান্য কতিপয় সমাজে সকল প্রকার পরিশ্রমের কার্য্য দাসদিগের উপর চাপান হইত। তাহাদিগকে পশুর মত খাটাইয়া সমাজের যাহা-কিছু প্রয়োজনীয় কার্য্য, তাহা করান

হইত। এই সকল কারণে ঐ সকল সমাজে দাসদিগের বিশেষ প্রয়োজন ছিল এবং দাস-সংখ্যা পূরণ ও বৃদ্ধির জন্য কার্থেজিনীয়ান ও ফিনিশীয়ান জলদস্যুরা ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্ত্তী নানা স্থান লুণ্ঠন করিয়া, তত্রত্য অধিবাসীদিগকে দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ করিতে কুণ্ঠিত হইত না। গ্রীক্‌দিগের মধ্যে বিজিত শত্রুকে দাসরূপে গ্রহণ করিয়া, প্রাণবধের পরিবর্ত্তে প্রায় পশুতে পরিণত করা হইত। প্রাচীন রোমকদিগের মধ্যেও রাজ্য-জয়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিশ্রম পরাঙ্মুখতা ও বিলাসিতা-বৃদ্ধির সহিত অসংখ্য দাস রাখিবার প্রথা প্রচলিত হয়। এই সকল দাসের অধিকাংশই পশ্চিম এসিয়া, আফ্রিকার উত্তর প্রদেশ ও ইউরোপ হইতে গৃহীত হইত। টিউটন, গল, আইবিরিয়, গথ, বিজিত গ্রীক্, দেশীয় (Dacian), লিবীয়ান, মাউ্, নিগ্রো প্রভৃতি নানা জাতীয় দাসে রোমক সাম্রাজ্য ছাইয়া গিয়াছিল। রোমকদিগের কৃষিক্ষেত্রগুলি অধিকাংশই দাসদিগের দ্বারা পরিচালিত হইত। ঐরূপ বস্ত্রবয়ন, শিল্পকর্ম্ম প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যের জন্য দাসের প্রয়োজন ছিল। ইহাদের সংখ্যা এত অধিক হইয়াছিল যে, সময়ে সময়ে ইহাদের বিদ্রোহদমনের জন্য প্রদেশসমূহে বিশাল বাহিনী প্রেরিত হইত। উহাদিগের সাহায্যে রক্তস্রোত বহিয়া যাইবার পর অতি কষ্টে দাস বিদ্রোহ নিবারিত হইত।

রোমক ও গ্রীক্ প্রভৃতির চক্ষে দাসেরা মনুষ্য বলিয়া পরিগণিত হইত না। তাহাদিগকে দ্রব্য বলিয়া (res) বিবেচনা করা হইত। প্রভু ইচ্ছামত দাসকে প্রহার করিতে, দণ্ড দিতে, বিকলাঙ্গ করিতে, এমন কি, মারিয়া ফেলিতেও পারিতেন। তাহাদিগের কোন অধিকার বা সম্পত্তি রাখিবার ক্ষমতা ছিল না। দাসের উপার্জ্জিত সমস্ত সম্পত্তি—এমন কি, তাহার সন্তান সন্ততিও প্রভুর বলিয়া পরিগণিত হইত। পরবর্ত্তী যুগে অবশ্য ইহার প্রতীকারের চেষ্টা হয় এবং কতিপয় সহৃদয় রোমক সম্রাটের অনুকম্পায় দাসদিগের অবস্থা উন্নীত হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতে দাসত্ব-প্রথা অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তির সময়ে রচিত পালি ও

অন্যান্য গ্রন্থ হইতে আমরা যাহা জানিতে পারি, তাহাতে প্রতীয়মান হয় যে, অনার্য্য ও বিজিত শত্রু ভিন্ন আর্য্যবংশীয় লোকও নানা কারণে দাসরূপে পরিণত হইতেন। যুদ্ধে বন্দিত্বের ফলে যে দাসত্ব হইত, উহা ভিন্ন নিম্নে দাসত্বের কয়েকটি কারণ দেওয়া গেল,—

(১) ঋণের দায়ে অনেকে দাসত্ব স্বীকার করিতে বা নিজ নিজ স্ত্রী-পুত্রকে বিক্রয় করিতে বাধ্য হইত। আর্য্য-সমাজেও ইহার অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। আমাদের মহাভারতে হরিশ্চন্দ্রের স্ত্রী-পুত্র বিক্রয় ও আত্মবিক্রয়ের কথা সকলেই অবগত আছেন। থেরীগাথা নামক পালি গ্রন্থে আছে যে, মৌর্য্যযুগের অব্যবহিত পূর্ব্বে রচিত ইসিদাসী নাম্নী থেরীর আত্মজীবনীর শেষভাগের (যে ভাগে তাঁহার পূর্ব্বজন্মের কথা বিবৃত আছে, সেই) অংশ পাঠে জানা যায় যে, ইসিদাসী পূর্ব্বজন্মে কোন এক দরিদ্র শকট-চালকের কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। শকট-চালক কোন বণিকের নিকট ঋণ করিয়াছিলেন এবং যথাকালে উক্ত ঋণ সুদ সমেত পরিশোধ করিতে না পারায়, বণিক্ বলপূর্ব্বক তাঁহার কন্যাকে ধরিয়া লইয়া যান এবং বোধ হয়, দাসীত্বে নিযুক্ত করেন। কালে ঐ কন্যার প্রতি বণিকের পুত্রের আসক্তি জন্মে। মূলটি এই,—

> তিংসতিবস্‌সম্‌হি মতো সাকটিককুলম্‌হি দারিকা জাতা।
> কপণম্‌হি অপ্‌পভোগে ধনিকপুরিসপাতবহুলম্‌হি ॥৪৪৩॥
> তং মং ততো সত্থবাহো উস্‌সন্নায় বিপুলায় বড্‌ঢিয়া।
> ওকড্‌ঢতি বিলপন্তিং অচ্ছিন্দিত্বা কুলঘরস্‌স ॥৪৪৪॥

(২) স্বেচ্ছায় আত্মবিক্রয়ের উদাহরণ—প্রাচীনতম বৌদ্ধগ্রন্থ বিনয়-পিটকের দুই স্থলে দেখা যায় (প্রথম খণ্ড, ১৬৮, ১৯১)।

(৩) উৎকট পাপ বা অপরাধের ফলে অনেকের স্বাধীনতা অপহরণ করার বিধি ছিল—অর্থশাস্ত্রেও এরূপ বিধি দেখা যায়। উচ্চ-বর্ণের স্ত্রীলোক স্বেচ্ছায় কুলটা বা দুশ্চরিত্রা হইলে তাহার স্বাধীনতা হরণ করিয়া, তাহাকে রাজার দাসীতে পরিণত করা হইত। "স্বয়ংপ্রবৃত্তা রাজদাস্যং

গচ্ছেৎ।” জাতকেও বর্ণনাপ্রসঙ্গে ঐরূপ একটি উদাহরণ পাওয়া যায়। পরবর্তী যুগেও এই সকল কারণে দাসত্ব ঘটিত। বৌদ্ধ ধর্ম্মের উৎপত্তির সময়ে দাসদিগের সন্তান-সন্ততিও দাস বলিয়া পরিগণিত হইত। বৌদ্ধ ধর্ম্মে দাসদিগের উন্নতিকল্পে কোন চেষ্টা দেখা যায় না। বৌদ্ধ ধর্ম্ম-প্রচারকেরা দাসকে মানুষ জ্ঞান করিতেন না এবং দাসদিগকে বৌদ্ধসঙ্ঘে প্রবেশ করিতে দিতেন না। অন্যান্য ধর্ম্ম-প্রচারকেরা বোধ হয়, দাসদিগের প্রতি অনুকূল ছিলেন এবং উহাদিগকে সঙ্ঘে প্রবেশাধিকার দিয়াছিলেন। যে সকল দাস কোন ধর্ম্মসঙ্ঘে প্রবেশ করিতে পারিত, তাহারা দাসত্বপাশ হইতে মুক্ত হইত।

অর্থশাস্ত্রের সময়ে দাসদিগের অবস্থা বিশেষ উন্নত হইয়াছিল। কৌটিল্যও, বোধ হয় তৎপূর্ব্ববর্ত্তী নীতিকারদিগের প্রবর্ত্তিত নীতি অনুসারে, আত্মবিক্রয়ী ভিন্ন অন্য কেহ কাহাকেও দাসরূপে বিক্রয় করিলে বিশেষ দণ্ডার্হ হইবেন, এইরূপ বিধি প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। কেহ নিজ পুত্রকেও দাসরূপে বিক্রয় করিতে পারিতেন না। কৌটিল্য বলেন,—“উদরদাসবর্জ্জমার্য্যপ্রাণমপ্রাপ্তব্যবহারং শূদ্রং বিক্রয়াধানং নয়তঃ স্বজনস্য দ্বাদশপণো দণ্ডঃ, বৈশ্যং দ্বিগুণঃ, ক্ষত্রিয়ং ত্রিগুণঃ, ব্রাহ্মণং চতুর্গুণঃ—পরজনস্য পূর্ব্বমধ্যমোত্তমবধা দণ্ডাঃ ক্রেতৃশ্রোতৃণাং চ।”

অর্থশাস্ত্রের সময়ে রাজনীতিজ্ঞেরা ও ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকেরা সমাজের দাসত্ব-প্রথাকে অতি ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন এবং উহা ঘৃণিত ম্লেচ্ছ জাতিরই যোগ্য—আর্য্যের পক্ষে অতি দূষণীয় বলিয়া জ্ঞান করিতেন। কৌটিল্য বলেন,—“ম্লেচ্ছানামদোষঃ প্রজাং বিক্রেতুমাধাতুং বা। ন ত্বেবার্য্যস্য দাসভাবঃ।” অর্থাৎ ম্লেচ্ছেরাই পুত্রাদি বিক্রয় করিয়া বা বন্ধক দিয়া থাকে, আর্য্যদের মধ্যে ঐ প্রথা নিষিদ্ধ।

দাসত্ব-প্রথার উচ্ছেদকল্পে দাস-বিক্রয়ীকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করার ব্যবস্থা হয়। এমন কি, ক্রেতা শ্রোতা সকলকেই দণ্ডিত করা হইত। এই সকলের ফলে দাস-বিক্রয় একেবারে উঠিয়া যায়। যাহারা দাস ছিল, ক্রমে তাহাদেরও অবস্থার বিশেষ উন্নতি হইয়া যায়। এই

এরূপ কঠোর শাসন-নীতির ফলে ভারতীয় দাসেরা নিম্নলিখিত অধিকার লাভ করিয়াছিল,—

১। উহারা নিজ নিজ পৈতৃক বা উত্তরাধিকার সূত্রে লব্ধ সম্পত্তি লাভ করিয়া, উহাতে স্বত্ববান্ হইতে পারিত। "আত্মাধিগতং স্বামিকর্ম্মা-বিরুদ্ধং লভেত, পৈত্র্যং চ দায়ম্।"

২। উহারা নিষ্ক্রয়মূল্য সংগ্রহ করিয়া নিজের স্বাধীনতা ক্রয় করিতে পারিত। "মূল্যেন চার্য্যত্বং গচ্ছেৎ।" কৌটিল্য আরও বলেন যে, দাস-প্রভু নিষ্ক্রয় মূল্য পাইলে দাসকে স্বাধীনতা দিতে বাধ্য ছিলেন; না দিলে দণ্ডার্হ হইতেন। "দাসমনুরূপেণ নিষ্ক্রয়েণার্য্যমকুর্ব্বতো দ্বাদশ-পণো দণ্ডঃ।"

৩। প্রভু কর্ত্তৃক নীচ কার্য্যে নিযুক্ত হইলে বা উৎপীড়িত হইলে, দাসেরা রাজপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া স্বাধীন হইতে পারিত।

৪। দাসের সম্পত্তি তাহার উত্তরাধিকারিগণেরই প্রাপ্য ছিল। তদভাবে দাসস্বামী উহা পাইত।

৫। প্রভু অত্যাচার করিলে দাসেরা রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া উহাকে সমুচিত দণ্ডে দণ্ডিত করাইতে পারিত।

৬। ক্রীতদাসীরা বলাৎকার-স্থলে সদ্যঃ মুক্তিলাভ করিত এবং প্রভুর ঔরসে উহাদের সন্তান জন্মিলে, উহারা সম্পত্তির অংশভাগী হইত।

৭। কেহ আত্মবিক্রয় করিলে উহার সন্তানাদি স্বাধীনই থাকিত।

এই সকল বিধির ফলে অবশিষ্ট দাসদিগের অবস্থা এত ভাল হইয়াছিল যে গ্রীক্ পর্য্যটকদিগের চক্ষে ভারতে দাসত্ব-প্রথার অস্তিত্বই বোধগম্য হয় নাই এবং গ্রীক্-রাজদূত মেগাস্থিনিস বলিয়া গিয়াছেন যে, ভারতীয়দের একটি মহত্ত্বের বিষয় এই যে, তাঁহাদের মধ্যে সকলেই স্বাধীন এবং দাস বলিয়া কেহ ভারতীয় সমাজে ছিল না। বিখ্যাত ঐতিহাসিক আরিয়ানও ঐ মত উদ্ধার করিয়া সমর্থন করিয়াছেন এবং বলিয়া গিয়াছেন যে, স্পার্টানদিগের ন্যায় ভারতবাসীরাও স্বজাতীয়

কাহাকেও দাসত্বে পরিণত করেন না। তবে ভারতবাসীদিগের আরও মহত্ব এই যে, তাঁহারা স্বাধীনতা হরণ করিয়া বিদেশীকেও দাসত্বে নিযুক্ত করেন না। বিদেশীয় মুখে, বিশেষতঃ আত্মাভিমানী সুসভ্য গ্রীকের মুখে এই প্রশংসা আমাদের কম গৌরবের কথা নহে।

যে যুগে ইউরোপের প্রধানতম রাজনীতিজ্ঞ ও দার্শনিক আরিষ্টটল দাসত্ব-প্রথার সমর্থন করিয়াছেন এবং প্রাণ-হননের পরিবর্ত্তে স্বাধীনতা-হরণ দোষাবহ নহে, বরং সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর—এই মত প্রচার করিয়াছেন, সেই যুগেই ভারতীয় রাজনীতিজ্ঞ মহামতি কৌটিল্য দাসত্ব-প্রথাকে বর্ব্বরোচিত বলিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছেন এবং আর্য্যসমাজভুক্ত ব্যক্তিসাধারণের স্বাধীনতা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, প্রাচীন ভারতীয় সামাজিক আদর্শ কত উচ্চ ছিল এবং এই নৈতিক ও সামাজিক উচ্চ আদর্শের ফলে ভারতবাসী সভ্য পাশ্চাত্য বিদেশীর চক্ষে কি উন্নত ও উদার বলিয়া প্রতীয়মান হইতেন। (*Cf.* Aristotle on Slavery; Politics. I)

দাস ভিন্ন আর এক শ্রেণীর লোকের কথা অর্থশাস্ত্রে পাওয়া যায়। ইহাদিগকে অহিতক নামে অভিহিত করা হইয়াছে। অহিতকদিগের সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই জানি না।

অহিতক ভিন্ন গ্রামভৃতক-শ্রেণীর লোকের প্রকৃত অবস্থা নির্ণয় করা কঠিন। ইহারা গ্রামের ভৃত্য বা গ্রামের কর্ম্মচারী বলিয়া পরিগণিত হইত। ইহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে এই মাত্র বলিতে পারা যায় যে, তাহারা সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন ছিল না। বোধ হয়, ইহারা গ্রামের জমি ভোগ করিত ও গ্রামের লোকের কার্য্য করিত। ইহাদিগকে রুস-দেশীয় Serf-দিগের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সমাজ-স্থিতি, গ্রাম ও নগর

অতঃপর তৎকালের লোকের অবস্থান (*e.g.*, distribution of population) সম্বন্ধে কিছু বলিব।

বর্তমানের ন্যায় তৎকালের ভারতের অধিকাংশ লোকই গ্রামে বাস করিত। গ্রামগুলির অধিকাংশই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের মধ্যে অবস্থিত ছিল এবং গ্রামবাসীরা প্রায়ই ভূমিকর্ষণ বা চাষবাস করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। ফলে গ্রামগুলির অবস্থান এবং ব্যবস্থাও সেইরূপ ছিল। গ্রামের মধ্যভাগেই বাস্তু বা বাসের স্থান ছিল। এই খণ্ডে লোকের বাসগৃহগুলি নির্ম্মিত হইত। সাধারণতঃ সমান্তরাল দুই তিনটি রাস্তা থাকিত ও উহার উভয় পার্শ্বে গৃহগুলি নির্ম্মিত হইত। গণ্ড-গ্রামগুলিতে অধিক লোকের বাস ছিল এবং উহার আয়তন ও নির্ম্মাণ-প্রণালী বিভিন্ন হইত। এই বাস্তুখণ্ডের চতুষ্পার্শ্বে চাষের জমি ও উহার পর বিস্তীর্ণ গোচারণভূমি বা গো-প্রচার থাকিত। এই গোচারণ-ভূমি সাধারণের সম্পত্তি ছিল এবং উহাতে সকলেরই অধিকার ছিল। সকলেই প্রয়োজন-মত নিজ নিজ গো-মহিষাদি চরাইতে পারিতেন, তবে অকারণ গো-মহিষাদি ছাড়িয়া রাখিলে দণ্ডনীয় হইতেন। অর্থশাস্ত্রে গোচারণভূমির রক্ষার জন্য বিশেষ বিধির উল্লেখ দেখা যায়। কেহ অবৈধ উক্ত ভূমি অন্যায়রূপে অধিকার করিলে (encroachment) বিশেষরূপে দণ্ডনীয় হইতেন। অর্থশাস্ত্রের নির্দেশমত উক্ত গোচারণভূমির বিস্তার একশত ধনুর কম হইবার ব্যবস্থা ছিল না। (১৭২ পৃষ্ঠা।)

মৌর্য্যযুগের অবসানের অব্যবহিত পরে রচিত মনু ও অন্যান্য স্মৃতিগ্রন্থে গণ্ডগ্রামে আরও অধিক পরিমাণে গোচারণভূমি রাখিবার ব্যবস্থা দেখা যায়।

গোচারণভূমির পর কোন কোন গ্রামে প্রাচীর বা বেড়া দিবার ব্যবস্থা ছিল—"ততঃ সমন্ততো গ্রামাদ্ধনুঃশতাপকৃষ্টমুপশালং কারয়েৎ।" আবার অনেক গ্রাম খোলা বা উন্মুক্ত ও প্রাচীরাদি বিহীন ছিল।

সাধারণতঃ গ্রামগুলি কর্ষক-বহুল ও শূদ্রপ্রায় হইত, অর্থাৎ শূদ্রাদির সংখ্যাই অধিক ছিল এবং উচ্চ-বর্ণের লোকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম হইত। কতকগুলি গ্রামে আবার মাত্র একবর্ণের বা একজাতীয় লোকের বা একবৃত্তির লোকের বাস ছিল। প্রাচীনতম বৌদ্ধগ্রন্থে অর্থাৎ বিনয়পিটক ও সুত্তপিটকে এইরূপ একবর্ণবহুল গ্রামের ভূরি ভূরি উল্লেখ দেখা যায়। ঐ সকল গ্রন্থের নানাস্থানে আমরা ব্রাহ্মণগ্রাম, বা ব্রাহ্মণনিগম, ক্ষত্রিয়গ্রাম ও বৈশ্য গ্রামের উল্লেখ পাইয়া থাকি।

উপরি উক্ত একবর্ণবহুল গ্রামের ন্যায় কতকগুলি গ্রামে কেবল এক ব্যবসায়ে নিযুক্ত বা এক জীবিকার লোকের বাস ছিল। প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে ও পরবর্ত্তী যুগে রচিত জাতকাদিতে ও মহাভারতের বহুস্থানে কুম্ভকারগ্রাম, স্বর্ণকারগ্রাম, তন্তুবায়গ্রাম ও কর্ম্মকারগ্রামাদির বহু উল্লেখ আছে। বাহুল্য ভয়ে উদাহরণ দিলাম না। এই শিল্পীরা নিজ নিজ ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য বা গ্রামবাসী উচ্চ-বর্ণের লোকের হস্তে উৎপীড়িত হইবার ভয়ে এক গ্রামে সকলে সম্মিলিত হইয়া বাস করিত। ইহাতে তাহাদের আত্মরক্ষা ও ব্যবসায়ে উন্নতি—উভয় দিক্‌ই বজায় থাকিত।

প্রত্যেক গ্রামের মধ্যে বিশ্রামাগার, মিলনাগার (শালা), সাধারণের ব্যবহারার্থ জলাশয়, উদ্যান (আরাম), শিক্ষাস্থান প্রভৃতি থাকিত। গ্রামের মধ্যে গ্রাম্যদেবতার মন্দিরাদি এবং চৈত্য-বৃক্ষাদিরও উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সকল মন্দিরাদি সাধারণের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইত। গ্রাম্যদেবতাদিগের নামে উৎসর্গীকৃত ধেনু বা বৃষগুলিও গ্রামের সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত। তাহাদিগকে মারিলে বা বধ করিলে অপরাধী বিশেষ দণ্ডিত হইত।

গ্রামগুলির লোকসংখ্যার অবধারণ করিবার কোন উপায় নাই;

তবে এইটুকু বলিতে পারা যায় যে, অধিবাসীর সংখ্যা মন্দ ছিল না। অর্থশাস্ত্রের জনপদ নিবেশাধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে যে, নূতন গ্রাম স্থাপিত হইতে হইলে, সাধারণতঃ উহাতে অন্যূন ১০০ হইতে ৫০০ ঘর কৃষক-পরিবারের স্থান রাখা হইত। এতদ্ভিন্ন উচ্চ বর্ণের লোক ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি, কারুবর্গ, শিল্পী, চিকিৎসক, পশু চিকিৎসক, গ্রামাধ্যক্ষ ও গ্রাম্য কর্ম্মচারিবর্গকে ভূমি দিয়া বাস করান হইত। ব্রাহ্মণ, পুরোহিত, শ্রোত্রিয় বা ঋত্বিক্ প্রভৃতি নিষ্কর ব্রহ্মদেয় ভূমি ভোগ করিতেন এবং তাঁহাদের দান বিক্রয়ের স্বত্ব থাকিত। অন্য গ্রাম-কর্ম্মচারীদিগকে যে জমি দেওয়া হইত, তাহাতে তাঁহাদের দান বিক্রয়ের স্বত্ব থাকিত না। তাঁহারা উহা যাবজ্জীবন ভোগ করিতে পারিতেন (এক পুরুষিকম্ বিক্রয়াধানবর্জ্জম্)। গ্রামবাসীরা গ্রামের কার্য্য নিজেরাই দেখিতেন, বাস্তু বা সীমা লইয়া বিবাদ হইলে, গ্রামবৃদ্ধেরা উহার বিচার করিতেন। ("ক্ষেত্রবিবাদং সামন্তগ্রামবৃদ্ধাঃ কুর্য্যুঃ।") মন্দির, দেবালয়, বা সাধারণের পূজাস্থান ও চৈত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কারাদি গ্রামবাসীদের হস্তেই ন্যস্ত ছিল। ("গ্রাম্য-ভাবে গ্রামাঃ পুণ্যশীলা বা প্রতিকুর্য্যুঃ।—১৭১ পৃষ্ঠা।) ঐরূপ নাবালকদিগের রক্ষণাবেক্ষণ ও তাহাদের সম্পত্তির রক্ষণের ভারও গ্রামবৃদ্ধদিগের হাতে ছিল। ("বালদ্রব্যং গ্রামবৃদ্ধা বর্দ্ধয়েযুঃ আব্যবহার-প্রাপণাৎ দেবদ্রব্যং চ।" ৪৮ পৃষ্ঠা।) তাঁহারা গ্রামের কৃষিকার্য্য বা অন্য কার্য্যের জন্য নিযুক্ত গ্রামভৃতকদিগের উপর কর্তৃত্ব করিতেন। গ্রামভৃতকেরা গ্রামেরই কর্ম্মচারী ছিল। তাহারা স্বাধীন কর্ম্মকর, কি দাসরূপে পরিগণিত হইত, তাহা জানা যায় না বোধ হয়, তাহারা অস্বাধীন ও গ্রামের জনসাধারণের ভৃত্য বলিয়া গণিত হইত।

সামান্য সামান্য অপরাধের বিচারভারও গ্রামবৃদ্ধদিগের হস্তে ন্যস্ত ছিল। গ্রামের কৃষক বা কারুবর্গ চুক্তিমত কার্য্য না করিলে, উহারা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইত এবং উক্ত অর্থদণ্ডের টাকা গ্রামের হিসাবে জমা হইত।

সাধারণের হিতার্থে কোন কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে, উহাতে গ্রামবাসি মাত্রকেই যথাসাধ্য সাহায্য করিতে হইত। গ্রামে কোন পুণ্যস্থান, দেবমন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিতে হইলে, কোন নূতন জলাশয় খনন করিতে হইলে বা কোন সেতু প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতে হইলে গ্রামবাসিমাত্রকেই উহাতে সাহায্য করিতে হইত। ঐরূপ গ্রামে কোন উৎসব-সমাজাদি হইলে বা নাটকাদির অভিনয় হইলেও গ্রামবাসীদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে হইত। কেহ নিজ সামর্থ্যানুযায়ী সাহায্য-দানে অনিচ্ছুক হইলে, তাঁহার প্রতি দণ্ড বিধান করিয়া তাঁহাকে তাঁহার সাহায্যাংশ-দানে বাধ্য করা হইত এবং তাঁহার ব্যবহারের শাস্তিস্বরূপ উক্ত কার্য্যের লাভ হইতে বঞ্চিত করা হইত। এ সম্বন্ধে অর্থশাস্ত্র হইতে আমরা অনেক নূতন কথা জানিতে পারি। জনপদনিবেশাধ্যায়ে কৌটিল্য বলেন,—

"পুণ্যস্থানারামাণাং চ। সম্ভূয় সেতুবন্ধাদপক্রামতঃ কর্ম্মকরবলীবর্দ্দাঃ কর্ম্ম কুর্য্যুঃ। ব্যয়কর্ম্মণি চ ভাগী স্যাৎ। ন চাংশং লভেত।"—৪৭ পৃ°।

অর্থাৎ কোন ব্যক্তি গ্রামের সাধারণের হিতকর কোন কার্য্যে যোগদান না করিলে, তাঁহাকে তাঁহার ভৃত্য বলীবর্দ্দাদি প্রেরণ করিতে বাধ্য করা হইবে। ব্যয়ের ভাগ তাঁহাকে বহন করিতে হইবে, কিন্তু লাভের অংশ তিনি পাইবেন না। আর এক স্থলে কৌটিল্য বলেন,—

"প্রেক্ষায়ামনংশদঃ সস্বজনো ন প্রেক্ষেত। প্রচ্ছন্নশ্রবণেক্ষণে চ সর্ব্বহিতে চ কর্ম্মণি নিগ্রহেণ দ্বিগুণমংশং দদ্যাৎ।" (পৃ° ১৭৭)

অর্থাৎ গ্রামে সাধারণের আমোদের জন্য কোন যাত্রা-থিয়েটারাদি হইলে বা কোন হিতকর কার্য্য হইলে, যদি কেহ উহাতে সাহায্য না করেন, তাহা হইলে উঁহাকে উহা দেখিতে বা শুনিতে দেওয়া হইবে না। যদি তিনি সাহায্য না করিয়া গোপনে উহাতে যোগদান করেন, তবে তাঁহাকে তাঁহার দেয়ের দ্বিগুণ দিতে বাধ্য করা হইবে।

বোধ হয়, এই সকল সাধারণের হিতকর বা প্রীতি-কার্য্যের অনুষ্ঠান হইলে গ্রামের কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে উহার কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত করা হইত।

রাজাদেশে সকলেই তাঁহার আদেশ শুনিতে বাধ্য ছিলেন। না শুনিলে দণ্ডিত হইতেন। কৌটিল্য বলেন,—

"সর্ব্বহিতমেকস্য ব্রুবতঃ কুর্য্যুরাজ্ঞাম্। অকরণে দ্বাদশপণো দণ্ডঃ।"—১৭৩ পৃ°।

অর্থাৎ সাধারণের হিতকর কার্য্যে নেতার আদেশ শুনিতে সকলেই বাধ্য। না শুনিলে দ্বাদশ পণ অর্থদণ্ড দিতে হইবে।

গ্রামের শাসন ও শান্তিরক্ষার জন্য গ্রামের কোন এক ব্যক্তি প্রজাসাধারণের মনোনীত বা রাজকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইতেন। অর্থশাস্ত্রের সময়ে এই কর্ম্মচারী 'গ্রামিক' নামে অভিহিত হইতেন। বৈদিক ও তৎপরবর্ত্তী যুগে এই নির্ব্বাচিত কর্ম্মচারীর নাম ছিল—'গ্রামণী'। গ্রামিককে গ্রামের অবস্থা পর্য্যালোচনার জন্য বা তদন্ত করিবার জন্য ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত। তাঁহার সাহায্যার্থ ও তাঁহার কার্য্যের অনুমোদনার্থ কতিপয় গ্রামবাসীও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। বিশেষ বিশেষ কার্য্যের জন্য গ্রামবাসীদিগের মধ্য হইতে এইরূপ সমভিব্যাহারী সহায়কদিগকে বাছিয়া লওয়া হইত। কেহ গ্রামিকের সমভিব্যাহারে তদন্তে যাইতে অস্বীকৃত হইলে বা অপারক হইলে, তাহাকে তদ্বিনিময়ে যোজন প্রতি ১½ পণ করিয়া অর্থদণ্ড দিতে হইত। কৌটিল্য বলেন,—

"গ্রামার্থেন গ্রামিকং ব্রজন্তম্ উপবাসাঃ পর্য্যায়েণ অনুগচ্ছেয়ুঃ অননুগচ্ছন্তঃ পণার্দ্ধপণিকং যোজনং দদ্যুঃ।"

এই সকল গ্রামবাসীকে Elected Commissioners বলা যাইতে পারে। গ্রামশাসনকল্পে গ্রামিককে কতকগুলি ক্ষমতা দেওয়া হইত। এগুলি বর্ত্তমানের Lower Magisterial powers বলা যাইতে পারে। প্রমাণ পাইলে গ্রামিক চোর বা পারদারিককে গ্রাম হইতে বাহির করিয়া দিতে পারিতেন। বিদ্বেষবশতঃ নিরপরাধ ব্যক্তিকে এইরূপে বহিষ্কৃত করিলে তিনি নিজেই দণ্ডিত হইতেন ("গ্রামিকস্য গ্রামাদস্তেনপারদারং নিরস্যতঃ চতুর্ব্বিংশতিপণো দণ্ডঃ"—১৭২ পৃ°)।

গ্রামিক ভিন্ন অন্য কোন গ্রামকর্ম্মচারীর নাম অর্থশাস্ত্রে নাই। তবে মহাভারতের সভাপর্ব্বের ৫ম অধ্যায় হইতে আমরা এ সম্বন্ধে আরও কিছু জানিতে পারি। সভাপর্ব্বের উক্ত পঞ্চম অধ্যায়টি অতি প্রাচীন এবং অর্থশাস্ত্রের সমসাময়িক বা তদপেক্ষাও প্রাচীন বলিয়াই বোধ হয়। উক্ত অধ্যায়ের ৮০র শ্লোকে যুধিষ্ঠিরের প্রতি নারদের প্রশ্নচ্ছলে গ্রামসমূহের পঞ্চ কর্ম্মচারীর কথা উল্লিখিত আছে[১]। তদ্ব্যতীত আর কিছু নাই। তবে টীকাকার এস্থলে কোন প্রাচীন গ্রন্থবিশেষ হইতে উক্ত পাঁচ জন কর্ম্মচারীর নামোদ্ধার করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে প্রতি গ্রামে নিযুক্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; ঐ পাঁচটি কর্ম্মচারীর নাম টীকাকারের মতে প্রশাস্তা, সমাহর্ত্তা, সংবিধাতা, লেখক ও সাক্ষী। উঁহাদের কার্য্য-সম্বন্ধে টীকাকারের মত নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল। তাঁহার মতে সমাহর্ত্তা গ্রাম হইতে রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া রাজকোষে প্রেরণ করিতেন। সংবিধাতা উহার হিসাব রক্ষণাদি তত্ত্বাবধান করিতেন। লেখকেরও ঐরূপ কার্য্য ছিল। প্রশাস্তা, বোধ হয়, গ্রামের শান্তিরক্ষার কার্য্য ও রক্ষীদিগের নেতা ছিলেন।

শান্তিরক্ষার জন্য গ্রামে শান্তিরক্ষক ও গুপ্তচরাদির ব্যবস্থা ছিল। তাহারা গ্রামের নানাস্থানে থাকিয়া লোকের চরিত্র বা কার্য্যাকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিত। চোর ধরিবার জন্য চোর রজ্জুক নামে এক স্বতন্ত্র কর্ম্মচারীর কথা অর্থশাস্ত্রে পাওয়া যায়। এই সকল কর্ম্মচারীরা গ্রামে চুরি হইলে চোর ধরিবার জন্য বা তদভাবে গ্রামবাসীর ক্ষতিপূরণের জন্য

১। মূল শ্লোকটি এই,—

কচ্চিচ্ছূরাঃ কৃতপ্রজ্ঞাঃ পঞ্চ পঞ্চস্বনুষ্ঠিতাঃ।
ক্ষেমং কুর্ব্বন্তি সংহত্য রাজন্ জনপদে তব ॥৮০॥

টীকাকার বলেন,—কচ্চিচ্ছূরা ইতি। প্রতিগ্রামং পঞ্চ পঞ্চ। তে চ প্রশাস্তা সমাহর্ত্তা সংবিধাতা, লেখকঃ সাক্ষী চেতি। সমাহর্ত্তা প্রজাভ্যো ধনমাহৃত্য রাজ্ঞে সমর্পয়িতা। সংবিধাতা প্রজাসমাহৃতস্য ধনস্য রক্ষকঃ প্রেষকঃ।

দায়ী ছিলেন। গ্রামে চুরি হইলে গ্রামাধ্যক্ষ দায়ী হইতেন। গ্রামের বাহিরে হইলে বিবীতাধ্যক্ষকে উহার জন্য দায়ী হইতে হইত।

প্রসঙ্গক্রমে আর একটি কথা গ্রাম সম্বন্ধে বলিব। অর্থশাস্ত্রের সময় গ্রামকর্ম্মচারীরা গ্রামের লোকের, তাহাদের জীবিকার, আয় ব্যয়ের ও তাহাদের সকিত বিত্তের ও গো মহিষাদি পশুরও সংখ্যার হিসাব রাখিতেন। সমসাময়িক যুগের গ্রীক পর্য্যটকেরাও ভারতীয় Census বা লোকগণনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

উপরি-উক্ত বর্ণনা হইতে সহজেই বোধগম্য হইবে যে, তৎকালে ভারতের গ্রামগুলিতে স্বায়ত্ত শাসন-প্রথা সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত ছিল। গ্রামবাসীদিগের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি ও সাহায্যাপেক্ষা এই শাসন-নীতির মূলমন্ত্র ছিল এবং ইহারই ফলে আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে গ্রামবাসীরা সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলেন এবং এই স্বাতন্ত্র্যের ফলে তাঁহাদের সামাজিক ও নৈতিক উৎকর্ষও যথেষ্ট ছিল। নিজের দেশে— নিজের হাতে ক্ষমতা রাখিয়া, নিজের কল্যাণার্থ কার্য্য করিতে সকলেই বদ্ধপরিকর ছিলেন। ফলে, গ্রামবাসিমাত্রেরই উন্নতি ও দেশের কল্যাণ সাধিত হইয়াছিল। রাজা করগ্রহণ করিয়া শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা করিয়া যাহাতে সকলেই সুখ-শান্তিতে থাকিয়া পরস্পরের অবিরোধে জীবনযাপন করিতে পারেন, তাহার জন্য যত্নবান্ থাকিতেন, দুর্ভিক্ষ, মহামারী বা বিপদের সময়ে প্রজাদিগকে যথাসম্ভব সাহায্য করিতেন; বিদেশী শত্রুর হাত হইতে দেশ রক্ষা করিতেন। যতদূর সম্ভব স্থানীয় শাসন-ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেন না। লোকদিগকে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি দেখাইতে এবং পরস্পরকে সাহায্য করিতে শিক্ষা দিতেন। অর্থশাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত অংশগুলি হইতে ইহার যাথার্থ্য স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। ইহার ফলে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ বিদূরিত হইয়া, দেশের লোকে দেশের মঙ্গল চিন্তা করিয়া দেশহিতকর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন।

বলা বাহুল্য, এই স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন-প্রথা প্রাচীন বৈদিক যুগ হইতে অব্যাহত ও অক্ষুণ্ণভাবে দেশে প্রবর্ত্তিত ছিল এবং এখনও ভারতের

নানাপ্রদেশে উহার যথেষ্ট প্রভাব আছে। মুসলমান রাজারা এ দেশে আসিয়া ঐ শাসননীতির উচ্ছেদের চেষ্টা করেন নাই। তবে ইংরাজদিগের রাজ্যস্থাপনের পর প্রথম প্রথম উহা ধ্বংস করিবার চেষ্টা হয়। তখন আবার এদিকেও ঐ স্বায়ত্ত-শাসনের ফলে হিংসাদ্বেষ, দলাদলি, মারামারির পথ উন্মুক্ত হইয়াছিল। ঐ সকল কারণে দেশের প্রকৃত অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়াছিল। ইংরাজেরা অজ্ঞতা ও স্বার্থান্ধতার বশীভূত হইয়া গ্রামের স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থার মূলোচ্ছেদ করেন। বর্ত্তমানে আবার গ্রামে স্বায়ত্ত-শাসন স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে।

অতঃপর নগরের কথা। বর্ত্তমানে নগর বলিতে বহুজনপূর্ণ বাণিজ্য-ব্যবসায়াদির ও শিল্পের কেন্দ্রীভূত বিশাল জনাবাসস্থান বুঝায়। লোকসংখ্যার আধিক্য, ঘন বসতি বা শিল্প বাণিজ্যের সুবিধাবশতঃ নানা শ্রেণীর লোকের বাস প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষত্বই গ্রাম ও নগরের পার্থক্যসূচক। প্রাচীন যুগের নগরের আরও কতকগুলি বিশেষত্ব ছিল। নগরবর্ণনা-প্রসঙ্গে তাহা বলা হইবে।

বৈদিক যুগে কৃষি ও পশুপালনবৃত্তি জনসাধারণের জীবিকানির্ব্বাহের প্রধান উপায় ছিল। গ্রাম্যজীবনই সুখকর ও সুবিধাজনক ছিল। তখন বড় বড় নগরের স্থাপনও হয় নাই এবং বৈদিক সাহিত্যে কোন বড় নগরের নামও দুষ্প্রাপ্য। এই যুগের পরবর্ত্তী সময়ে ক্রমে নানা প্রকার প্রয়োজনীয় শিল্পের উন্নতি হইতে লাগিল এবং কৃষিকার্য্য ত্যাগ করিয়া বহু লোক জীবিকার জন্য ঐগুলি অবলম্বন করিল। সঙ্গে সঙ্গে ধনী লোকেরাও গ্রাম ছাড়িয়া, ব্যবসায়ের সুবিধাজনক স্থানের সন্ধান করিয়া নূতন বসতি-স্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শ্রমিকের সমবায়ে ও রাজা বা রাজকর্ম্মচারীর সহায়তায় সঞ্চিত ধনাদি রক্ষার বিশেষ ব্যবস্থার ফলে নদীতটে বা বাণিজ্যাদির সুবিধাজনক স্থানে নগরের স্থাপন হইতে লাগিল। খৃঃ পূঃ বহু শতাব্দীর বহু পূর্ব্বেই ভারতে অসংখ্য নগর স্থাপিত হইল। প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যে আমরা বুদ্ধের সময়ের তক্ষশিলা, বারাণসী, শ্রাবস্তী, উজ্জয়িনী, কৌশাম্বী,

বৈশালী, রাজগৃহ, গয়া প্রভৃতি অনেকগুলি বিশাল নগরীর উল্লেখ পাইয়া থাকি।

এই নগরগুলি প্রায়শঃই পরিখা, উচ্চ প্রাচীর ও প্রাকারবেষ্টিত ছিল। প্রাচীরের স্থলে স্থলে আবার শত্রুর গতি পর্য্যবেক্ষণ বা শত্রুসেনার গতিরোধের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গ বা tower থাকিত। প্রাচীর সাধারণতঃ পাষাণনির্ম্মিতই হইত। স্থলে স্থলে প্রস্তরের অভাব হইলে, কাষ্ঠেরও প্রাচীর নির্ম্মাণ করা হইত। টাওয়ারগুলি গোল বা চতুষ্কোণাকৃতি হইত ও উচ্চতায় প্রাচীর ছাড়াইয়া অনেক দূর উঠিত। মেগাস্থিনিসের বর্ণনায় তিনি পাটলিপুত্র-সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, পাটলিপুত্র সহরটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ৯ মাইল ও প্রস্থে প্রায় ১॥ মাইল (৯০ × ১৫ ষ্টাডিয়া, ষ্টা = ১/৮ মাইল) ছিল। সহরটির চারিধারে প্রাকার ও প্রাকারের পর উচ্চ কাষ্ঠনির্ম্মিত প্রাচীর ছিল। প্রাচীরের মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু অন্তর একটি করিয়া মোটের উপর ৫৭০টি ক্ষুদ্র টাওয়ার বা দুর্গ ও ৬৪টি দ্বার ছিল। এই সকল দুর্গমধ্যে সদাসর্ব্বদা সুসজ্জিত সৈন্য প্রস্তুত থাকিত।

অর্থশাস্ত্রের দুর্গবিধান ও দুর্গনিবেশাধ্যায় হইতেও তৎকালের নগরীর নির্ম্মাণপ্রণালী-সম্বন্ধে অনেক বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় পাওয়া যায়।

উপরে উল্লিখিত দুইটি অধ্যায় হইতে বুঝা যায় যে, কোন নগরী নির্ম্মাণ করিতে হইলে, উহার ভূমি নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হইত। ভূমি-নির্ব্বাচনের পর, উহার চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত ও গভীর পরিখা খনন করিয়া উহা হইতে ৪ দণ্ড (প্রায় ২৪ ফুট) ১২ দণ্ড বিস্তৃত ও ৬ দণ্ড উচ্চ বপ্র (rampart) নির্ম্মাণ করা হইত। ইহার উপরে আবার উচ্চ ইষ্টক বা পাষাণনির্ম্মিত প্রাচীর নির্ম্মিত হইত।

প্রাচীরের মধ্যে মধ্যে লোকের প্রবেশ ও নির্গমের জন্য কয়েকটি দ্বার রাখিয়া দেওয়া হইত। অর্থশাস্ত্রের দুর্গনিবেশাধ্যায়ে নগর বা দুর্গের দ্বাদশটি দ্বারের উল্লেখ আছে। এগুলির উভয় পার্শ্বও বিশেষরূপ সুরক্ষিত থাকিত। এই দ্বারগুলির মধ্যে একটিকে মহাদ্বার (main gate)

বলা হইত। এই দ্বারের পার্শ্বেই আবার এক দিকে মহাদ্বারাধিপের বা নগরপালের কর্ম্মচারী ও রক্ষিগণের আবাস ছিল এবং অপর দিকে শুল্কাধ্যক্ষের অফিস বা শুল্কশালা থাকিত (শুল্কাধ্যক্ষঃ শুল্কশালাধ্বজং চ প্রাঙ্মুখং উদঙ্মুখং বা মহাদ্বারাভ্যাশে নিবেশয়েৎ)।

কেহ নগরে প্রবেশ করিতে গেলে বা নগর হইতে বাহির হইয়া যাইতে গেলে দৌবারিক বা নগরপালের কর্ম্মচারীরা উহার সম্বন্ধে সম্যক্ সন্ধান লইয়া তবে প্রবেশ করিতে দিত। অবশ্য দিনমানে বা পূর্ব্বরাত্রেও ঐরূপ ব্যবস্থা ছিল কি না তাহা জানা যায় না, তবে নূতন আগন্তুক-মাত্রকেই মুদ্রা (বা passport) দেখাইতে হইত। অসময়ে কেহ নগর হইতে বাহির হইলে বা নগরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিলে, তাহাকে বিশেষ সন্দেহের চক্ষে দেখা হইত এবং কোনরূপ সন্দেহের কারণ থাকিলে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইত। (প্রব্রজিতাগতৌ চ নিবেদয়েৎ। অন্যথা রাত্রিদোষং ভজেৎ। * * * পথিকোৎপথিকাশ্চ বহিরন্তশ্চ নগরস্য দেবগৃহপুণ্যস্থানবনশ্মশানেষু সব্রণমনিষ্টোপকরণমুদ্ভাণ্ডীকৃতমাবিগ্ন মতিস্বপ্নমধ্বক্লান্তমপূর্ব্বং বা গৃহ্ণীয়ুঃ—অ. শা., ১৪৪ পৃঃ)। অর্থাৎ নূতন আগন্তুক, আহত, ক্লিষ্ট বা পীড়িত ব্যক্তিমাত্রকেই নগরপালের লোকেরা গ্রহণ করিবে। ঐরূপ যদি কেহ লুক্কায়িত ধন লইয়া বা অনিষ্টের উপকরণাদি লইয়া আসে, তবে তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে হইবে। মোটের উপর, সন্দেহের কারণ থাকিলেই পুলিশের হস্তে পড়িতে হইত

সন্ধ্যার কিছু পরে, বোধ হয়, নগরদ্বার-রোধের ব্যবস্থা ছিল। এই সময়ের পরে কেহ নগরে প্রবেশ করিতে চাহিলে বা নগর ত্যাগ করিতে চেষ্টা করিলে, তাহাকে বিশেষ কারণ দর্শাইয়া নগরাধ্যক্ষের অনুমতি লইতে হইত। কোশলরাজ প্রসেনজিৎ দীর্ঘচারায়ণ নামক মন্ত্রীর চক্রান্তে নগরের বাহিরে আসিলে, ষড়যন্ত্রানুযায়ী নগরদ্বার রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং এই কৌশলের ফলে তৎপুত্র বিরূঢ়কের রাজা হইবার সুবিধা হয়।

নগরপালের কর্ম্মচারীদের ন্যায় শুল্কাধ্যক্ষের লোকেরা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লোকের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ ও তাহাদের সঙ্গের পণ্যাদি (মোট-ঘাট)

পরীক্ষা করিত। যদি কাহারও সহিত যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র, বর্ম্ম কবচাদি বা অন্য কোনরূপ নিষিদ্ধ বস্তু পাওয়া যাইত, তবে উহা বাজেয়াপ্ত করিয়া লওয়া হইত। অন্য সকলপ্রকার পণ্যের উৎপত্তিস্থল ও মূল্য প্রভৃতি নিরূপণ করিয়া উহার উপর আমদানী- ও রপ্তানী-ভেদে শুল্ক লওয়া হইত। কেহ শুল্ক না দিয়া মাল লইয়া যাইতে চেষ্টা করিলে বা কম শুল্ক দিবার চেষ্টা করিলে উহাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হইত।

পণ্যের উপর শুল্ক ছাড়া ভারবাহী পশু ও ভারবাহীদিগের উপরও শুল্ক ছিল। বিবাহ, দেবপূজা, যজ্ঞ বা চূড়াকর্ম্ম ও উপনয়নাদি সংস্কারের জন্য কেহ মাল লইয়া আসিলে, তাহার উপর শুল্ক লওয়া হইত না। শ্রোত্রিয়াদির দ্রব্যাদির উপরও কোন শুল্ক ছিল না।

এই ত গেল নগরপ্রাচীর ও নগরদ্বারের কথা। অতঃপর নগরের ভিতরের কথা কিছু বলিব। নগরের ভিতরের ব্যবস্থাও বর্ত্তমান হইতে অনেক বিভিন্ন ছিল। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছু পাওয়া যায় না, তবে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহা হইতে কিছু বলিবার চেষ্টা করা যাইবে। অর্থশাস্ত্রের দুর্গনিবেশাধ্যায় হইতে জানা যায় যে, নগর বা দুর্গের তিনটি পূর্ব্বদিক্ হইতে পশ্চিমদিকে ও তিনটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা রাজপথ থাকিত। রাজপথগুলি যেখানে নগরপ্রাচীরের সহিত মিলিত, সেই স্থানেই একটি করিয়া দ্বার থাকিত।

এই কয়টি বড় বড় রাজপথ ছাড়া আরও অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পথ থাকিত। নগরের ভিতরে এক এক খণ্ডে (sectorএ) এক এক জাতীয় বা এক ব্যবসায়ের লোকদিগের স্থান দেওয়া হইত। ভিন্ন ভিন্ন অংশে গন্ধমাল্যব্যবসায়ী, প্রধান প্রধান শিল্পব্যবসায়ী, সূত্রব্যবসায়ী, খাদ্য-ব্যবসায়িগণ, ঊর্ণা- বা সূত্র ব্যবসায়ী তন্তুবায়গণ, চর্ম্মকারবর্গ, অস্ত্রশস্ত্রাদিনির্ম্মাতৃবর্গ, স্বর্ণকার, লৌহকার প্রভৃতিদিগকে স্বতন্ত্র স্থান দেওয়া হইত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যাদির বসতি ভিন্ন ভিন্ন অংশে ছিল। কুম্ভকার প্রভৃতি যাহাদের অগ্নি লইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহাদের স্থান স্বতন্ত্র ছিল। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর

শূদ্র কর্ষক ও ভৃত্যাদিও স্বতন্ত্র স্থানে বাস করিত। বেশ্যাদিগের পল্লী ভিন্ন ছিল। তাহাদের পল্লীর নিকটেই মদ্যব্যবসায়ী, পক্কমাংস- ও পক্কৌদন-ব্যবসায়ীদিগের বাস ছিল। অর্থশাস্ত্রের দুর্গনিবেশাধ্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ী ও ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোকের আবাসস্থানের যথাযথ নির্দ্দেশ করা আছে। এখানে উহার সারাংশমাত্র উদ্ধৃত করা হইল।

নগরের মধ্যে গৃহস্থদিগের বাসস্থান ও দোকান পশার ভিন্ন উহার অংশবিশেষে রাজকীয় কর্ম্মচারীদিগের অধিকরণ অর্থাৎ আফিস ও বাসস্থান ছিল। সাধারণতঃ প্রত্যেক নগরেই একটি করিয়া ধর্ম্মাধিকরণ বা বিচারালয়, নগরপাল বা নগররক্ষকের অধিকরণ বা আফিস ছিল। প্রত্যেক পল্লীমধ্যে বা উপযুক্ত স্থানে একটি করিয়া শুল্ক বা ফাঁড়ি, শুল্কাধ্যক্ষের আফিস ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিভাগের কর্ম্মচারীদিগের আবাসস্থান ছিল। এতদ্ভিন্ন নগরের স্থানে স্থানে হাট বাজার থাকিত। উক্ত হাট বাজারের সম্বন্ধেও কতকগুলি বিশেষত্ব ছিল।

শুল্কগ্রহণের ব্যবস্থার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। শুল্কগ্রহণ ভিন্ন রাজকর্ম্মচারিগণ পণ্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেন এবং কেহ অতিরিক্ত মূল্য গ্রহণ করিলে উহার যথাযথ দণ্ড বিধান করিতেন অতিরিক্ত লাভে ক্রয়-বিক্রয় একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল রাজকর্ম্মচারীদিগের ও রাজব্যবস্থার মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল, যাহাতে পণ্য সুলভে বিক্রীত হয় (উভয়ং চ প্রজানামনুগ্রহেণ বিক্রাপয়েৎ। স্থূলমপি চ লাভং প্রজানাম্ ঔপঘাতিকং বারয়েৎ)। সাধারণতঃ স্বদেশীয় পণ্যে বণিকেরা শতকরা পাঁচ টাকা ও বিদেশ হইতে আমদানী পণ্যের উপর শতকরা ১০৲ টাকা হিসাবে লাভ গ্রহণ করিতে পারিতেন

দোকান ও বাজার সম্বন্ধে আরও একটি বিশেষ কথা বলিবার আছে। এখনকার দিনের মত তৎকালে যে-কেহ ইচ্ছা করিলেই কোন ব্যবসায় করিতে বা দোকান করিতে পারিতেন না। পণ্যাধ্যক্ষের অনুমতি পাইবার পর, দোকান করিয়া মাল খরিদ ও সঞ্চয় করিতে হইত। নচেৎ সমস্ত মাল সরকারে বাজেয়াপ্ত করা হইত। ‘ তেল

ধান্ত পণ্যানিচয়াংস্তাংশ্চাতাঃ কুর্য্যুঃ ; অন্যথা নিচিতমেষাং পণ্যাধ্যক্ষো গৃহ্ণীয়াৎ)। বণিক্‌দিগের পক্ষে একযোটে দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি করা বা নিজেদের সুবিধার জন্ত কোন জিনিষের দর কমান একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল। যাহা হউক, এসকল কথা অন্য স্থানে আমরা আলোচনা করিব। তবে কয়েকটি মাত্র কথা বিশেষ প্রয়োজনীয় হিসাবে এস্থলে উল্লেখ করিব। বাণিজ্য দ্রব্যাদির ক্রয়মূল্যাদির নিরূপণের জন্ত শুল্কাধ্যক্ষ ও পণ্যাধ্যক্ষ ভিন্ন পৌতবাধ্যক্ষ ও সংস্থাধ্যক্ষ নামে আরও দুইজন কর্ম্মচারী ছিলেন। ইঁহারা দ্রব্যাদির বিক্রয়মূল্য নির্দ্ধারণ করিতেন ; ক্রয়বিক্রয়ে জুয়াচুরি নিবারণ ও ওজন বাটখারা প্রভৃতির তত্ত্বাবধান করিতেন। আবার কারুশিল্পীদিগের কার্য্য তত্ত্বাবধানের জন্ত ও পারিশ্রমিক নিরূপণের জন্ত তিনজন মন্ত্রী বা উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী লইয়া একটি বোর্ড ছিল। কারুশিল্পীরা যথেচ্ছ পারিশ্রমিক লইতে পারিতেন না ; তাঁহারা ইঁহাদের বেতন নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেন। প্রভু ও শিল্পী বা কর্ম্মকরদিগের মধ্যে বেতন লইয়া মতভেদ হইলে সাধারণতঃ ঐ বিষয়ে দক্ষ ব্যক্তিদিগের (মূলে কুশলাঃ Experts) হস্তে উহার বিচারভার দেওয়া হইত। অথবা কারুশিল্পীদিগের বেতন হ্রাসের জন্ত দল পাকাইলে ঐ দলের লোকেরা দণ্ডিত হইতেন। কারুশিল্পিনাং কর্ম্মগুণাপকর্ষম্ আজীবং বিক্রয়ং ক্রয়োপঘাতং বা সম্ভূয় সমুত্থাপয়তাং সহস্রং দণ্ডঃ। অ° শা°, ২০৫ পৃ॰)।

অর্থশাস্ত্র ভিন্ন অন্য গ্রন্থে আমরা এই সকল কর্ম্মচারীদিগের বিশেষ উল্লেখ পাই না। তবে সমসাময়িক গ্রীক্ ঐতিহাসিক ও পর্য্যটকগণ দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ, ক্রয়বিক্রয়, শুল্কগ্রহণ, ওজনাদির তত্ত্বাবধান প্রভৃতির জন্ত ৬টি বোর্ডের বা কর্ম্মচারিসভার উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থশাস্ত্রে বোর্ডের উল্লেখ নাই, তবে অনুমান করা যায় যে, এক একটি বিষয়ের তত্ত্বাবধানের জন্ত একজন করিয়া উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী না থাকিয়া, উক্ত বিভাগের পরিচালনের জন্ত ৫।৬ জন সমানপদস্থ লোক রাখা হইত। কৌটিল্যের নিজের অভিপ্রায়ও এইরূপ। তিনি একজনের উপর কোন এক বিভাগের সম্পূর্ণ ভার দিতে একেবারেই নারাজ ছিলেন বলিয়া

বোধ হয়। কারণ, তিনি রাজাকে ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ দিয়াছেন যে, কোন এক ব্যক্তির উপর সম্পূর্ণরূপ নির্ভর করা একেবারেই উচিত নহে। এ বিষয়ে তাঁহার মতের সারাংশস্বরূপ একটি উপদেশ উদ্ধৃত করিলাম; সেইটি এই,—

"বহুমুখ্যম অনিত্যং চাধিকরণং স্থাপয়েৎ।"

অর্থাৎ প্রত্যেক অধিকরণের ভার বহু লোকের হস্তে অর্পিত হইবে এবং চিরস্থায়ী ভাবে কাহাকেও এক বিভাগে রাখা হইবে না। মতটি আমাদের নিকটও সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক, যদি গ্রীকদিগের উল্লিখিত বোর্ডগুলির সহিত এই অর্থশাস্ত্রোল্লিখিত অধ্যক্ষ কয়টির কার্য্যের সমতা থাকে, তাহা হইলে গ্রীকবিবরণী ও অর্থশাস্ত্র উভয়েরই মূল্য আমাদের নিকট বিশেষ বর্দ্ধিত হইবে।

নগরের শাসন-সংক্রান্ত অন্যান্য কার্য্যের এবং স্বাস্থ্যরক্ষা ও শান্তিরক্ষার ভার ছিল নাগরক বা নগরপালের হস্তে। নগররক্ষক একাধারে পুলিশ কোতোয়াল, পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট ও মিউনিসিপাল ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তাঁহার কর্ম্মচারীরা নগরের লোকসংখ্যা, লোকের আয়-ব্যয়, জীবিকা প্রভৃতির হিসাব রাখিতেন, পাষণ্ড অর্থাৎ ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি, ভিক্ষুক ও নবাগত প্রভৃতির গতিবিধি লক্ষ্য করিতেন, বেশ্যা, মদ্যব্যবসায়ী (শৌণ্ডিক), পক্কমাংস- বা অন্ন বিক্রেতা হোটেলওয়ালাদের আড্ডার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন; মদ খাইবার আড্ডা (পানাগার), জুয়াখেলার আড্ডা প্রভৃতির দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন এবং কোন সন্দেহের কারণ থাকিলেই অপরাধীদিগকে ধরিয়া উহাদিগকে হয় কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য করিতেন বা বরাবর হাজতে প্রেরণ করিতেন।

নগরের রাস্তা ঘাটের সমস্ত ব্যবস্থাও নগররক্ষকের কর্ম্মচারীদিগের হস্তে ছিল। কেহ পথে ময়লা ফেলিলে, মলমূত্র ত্যাগ করিলে বা মৃতদেহ ফেলিলে বা কোন প্রকারে সাধারণের স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত ঘটাইলে দণ্ডিত হইতেন। খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশাইলে, দূষিত দ্রব্য বিক্রয়

করিলে বা পচা মাংস বিক্রয় করিলে বিক্রেতাকে দণ্ড দেওয়া হইত। তৎকালে মাংস প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইত বলিয়া উহার বিক্রয়ের তত্ত্বাবধানের জন্য সূনাধ্যক্ষ নামে একজন বিশেষ কর্ম্মচারী ছিলেন। অন্যপ্রকার খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল দিলে নাগরক বা অন্য কোন ম্যাজিষ্ট্রেট দণ্ড বিধান করিতেন। ঐরূপ অগ্নিনির্ব্বাপণে সহায়তা না করিলে বা অগ্নিনির্ব্বাপণের উপকরণাদি না রাখিলে লোকে দণ্ডিত হইত।

নগরের প্রত্যেক প্রান্তে, চৌমাথায় ও অন্যান্য স্থানে রাজপ্রহরীরা দিনে ও রাত্রে পাহারায় নিযুক্ত থাকিত। এতদ্ভিন্ন নানা ছদ্মবেশে বহু প্রকারের চর লোকের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিত।

সন্ধ্যার কিছু পরে বোধ হয়, দ্বার বন্ধ করা হইত (একথা স্পষ্টভাবে অর্থশাস্ত্রে নাই) ও মধ্যে মধ্যে তূর্য্যধ্বনি করা হইত সন্ধ্যার পর বা অসময়ে নগরপ্রবেশ বা নগর হইতে বহির্গমন নিষিদ্ধ ছিল। তবে বিশেষ কার্য্যবশতঃ বাহির হইতে হইলে অনুমতি লইয়া যাইতে হইত। সন্দেহস্থলে বা উপযুক্ত কারণ না দর্শাইতে পারিলে দণ্ডিত হইতে হইত। রাত্রিকালে বিনাকারণে ঘুরিয়া বেড়ান বিশেষ দোষের বলিয়া গণ্য ছিল। অবশ্য বিশেষ প্রয়োজন হইলে—গৃহে প্রসববেদনা উপস্থিত হইলে বা রোগীর জন্য চিকিৎসক আনিতে হইলে, বা আগুন লাগার পর নগরপালের তূর্য্যধ্বনি হইলে তন্নিবারণার্থ বা কোন যাত্রা থিয়েটারাদি হইলে নগরপালের অনুমতিপত্র লইয়া লোকে গমনাগমন করিতে পারিত (সূতিকাচিকিৎসকপ্রেতপ্রদীপযাননাগরতূর্য্যপ্রেক্ষাগ্নিনিমিত্ত-মুদ্রাভিশ্চাগ্রাহ্যাঃ—অ° শা°, ১৪৬ পৃ°)। রাত্রিতে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বা ছদ্মবেশে বিকটবেশ ধরিয়া ঘুরিয়া বেড়ান বিশেষ দোষের ছিল (প্রচ্ছন্নবিপরীতবেশাঃ প্রব্রজিতা দণ্ডশস্ত্রহস্তাশ্চ মনুষ্যা দোষতো দণ্ড্যাঃ)। এতদ্ভিন্ন রাজান্তঃপুরের নিকট বেড়াইলে বা তন্মধ্যে প্রবেশ করিলে বা নগরপ্রাচীরে আরোহণ করিলে গুরুতর মধ্যম সাহস দণ্ড দেওয়া হইত (রাজপরিগ্রহোপগমনে নগররক্ষারোহণে চ মধ্যমঃ সাহসদণ্ডঃ)।

বেশ্যাগার, পানাগার ও দ্যূতক্রীড়ার স্থানের বিশেষ বিশেষ বন্দোবস্ত

ছিল। ঐ যুগে বেশ্যারা রাজার সম্পত্তি বা রক্ষাধীন বলিয়া গণ্য হইত এবং তাহাদের শাসন ও রক্ষণের জন্য নগরগণিকাধ্যক্ষ নামে একজন বিশেষ কর্ম্মচারী থাকিতেন। পানাগারগুলিও সুরাধ্যক্ষ নামে এক বিশেষ কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইত। জুয়াখেলা ও পাশাখেলার আড্ডাগুলিতে তত্ত্বাবধানের জন্য একজন অন্য কর্ম্মচারী ছিলেন। বেশ্যা, মদ ও জুয়া প্রভৃতি হইতে রাজ্যের কিছু আয় হইত। পরে ঐগুলির বিশেষ বর্ণনা করা হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়

অর্থশাস্ত্রে সমাজচিত্র

১ পারিবারিক জীবন—পল্লীবিভাগ ; বাস্তু (বাসগৃহ)

গৃহ-নির্ম্মাণ-ব্যবস্থা

গ্রাম ও নগরের কথা বলা হইয়াছে। এখন এক একটি পল্লী বা পাড়ার অবস্থা কেমন ছিল, তাহা বলিব। সাধারণতঃ এক জাতির বা বর্ণের কতকগুলি পরিবার লইয়া এক একটি পল্লী গঠিত হইত। এক একটি পল্লীতে দুই তিনটি করিয়া প্রশস্ত রাজপথ থাকিত। এই রাজপথের উভয়পার্শ্বেই লোকের বাস্তুভিটা নির্ম্মিত হইত। মৌর্য্যযুগের বাস্তু-নির্ম্মাণ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোন বিশদ বিবরণ আমাদের হস্তগত হয় নাই। আরও দুঃখের বিষয়, ৪র্থ শতাব্দীর কোন গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে অর্থশাস্ত্রে বাস্তুর সম্বন্ধে যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহা হইতে এবং গ্রীকদিগের বর্ণনা হইতে আমাদের এ বিষয়ে যৎকিঞ্চিন্মাত্র সাহায্য হইবে। ঐ সকল বর্ণনা হইতে বোধ হয় যে, দরিদ্র লোকে সাধারণতঃ বাঁশের বা কাঠের বাটীতে বাস করিত। গৃহ নির্ম্মাণের জন্য কাঠের বহুল ব্যবহার ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়; তবে রাজা, রাজকর্ম্মচারী, ধনী, শ্রেষ্ঠী বা বণিকেরা নিজ নিজ পরিবারবর্গের জন্য ইষ্টক ও প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাসাদাদি নির্ম্মাণ করাইতেন। অর্থশাস্ত্রের "সন্নিধাতৃনিচয়কর্ম্ম" ও "গৃহবাস্তুক" অধ্যায় দুইটীতে পাকা ইটের ও প্রস্তরের গৃহ ও স্তম্ভাদির উল্লেখ আছে। জাতকেও ইষ্টক বা প্রস্তর নির্ম্মিত দ্বিতল, ত্রিতল—এমন কি, সপ্ততল প্রাসাদেরও উল্লেখ দেখা যায়।* ইষ্টক বা প্রস্তর নির্ম্মিত স্তম্ভের উল্লেখ প্রাচীন বৌদ্ধসাহিত্যের বহুস্থানেই আছে। প্রস্তরের

* জাতক ১—২২৭ ও ৪৯০, ৪—৩৭৮, ৫—৫২, ৬—৫৭৭ ইত্যাদি।

প্রাচীরেরও উল্লেখ আছে এবং মিঃ বিক্‌ ডেভিডস্‌ অনুমান করেন যে, গিরিব্রজের একটা পার্ব্বত্য-দুর্গের প্রাচীরের যে ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, তাহা খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। পাষাণ-স্থাপত্য ও পাষাণ-স্থপতির উল্লেখও অন্যান্য প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

অশোকের সময় পাষাণ-স্থাপত্য বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছিল অশোক-স্তূপগুলির অধিকাংশই ইষ্টক বা প্রস্তর নির্ম্মিত। আজিও যে সকল অশোক-স্তম্ভ বর্ত্তমান আছে, তাহার কারুকার্য্য ও পালিস দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। এবং অশোকের সময়ের পাটলিপুত্রের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতেও বাস্ত বা গৃহ নির্ম্মাণের সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। সাধারণতঃ একতলা বাটীই বেশী ছিল তবে দ্বিতল বাটীরও ব্যবস্থা দেখা যায় ছাদগুলি মজবুত করিয়া তৈয়ার করা হইত। ছাদ পাকা না হইলে, বর্ষার সময় ঘরের মধ্যে জল যাহাতে না আসে, ও ছাদের জল কাটাইবার জন্য মাদুর বা অন্য কোনরূপ মোটা জিনিস চাপা দেওয়া হইত।

বাটীর ভিত্তি-দেওয়াল বা ছাদ আইন অনুযায়ী না হইলে গৃহস্বামী দণ্ডনীয় হইতেন।

প্রত্যেক বাটীতেই কয়েকটা করিয়া বাসের ঘর, উঠান, জলপ্রণালী ও কূপ থাকিত। নর্দ্দামা যদি জলনিকাশের উপযোগী না হইত এবং তাহার ফলে সাধারণের স্বাস্থ্যহানি বা অন্য প্রকার অসুবিধা ঘটিলে গৃহস্বামীকে দণ্ডনীয় হইতে হইত অর্থশাস্ত্রে ঐরূপ নালা নর্দ্দমারও ভিত্তির সরকারী মাপ দেওয়া আছে বাটীতে গোশালা রাখিলেও তাহার ঐরূপ স্বতন্ত্রভাবে ব্যবস্থা করিতে হইত অগ্নিশালাও সাবধানে নির্ম্মাণ করা হইত।

ধনী লোকে বাড়ী তৈয়ার করিয়া ভাড়া খাটাইতেন। ইহারও উল্লেখ অর্থশাস্ত্রে আছে সাধারণতঃ এক বৎসরের হিসাবে বাটী ভাড়া দেওয়া হইত। ভাড়া বাকী পড়িলে উচ্ছেদেরও বিধি দেখা যায়

সমস্ত বৎসরের ভাড়া লওয়া হইত। নিজের ইচ্ছায় কেহ বাড়ী ত্যাগ করিয়া গেলে, তিনি ভাড়ার টাকা ফেরৎ পাইতেন না।

কোন গৃহস্বামী বাটী বিক্রয় করিতে উদ্যোগী হইলে, তাঁহার জ্ঞাতিবর্গ ও তদভাবে প্রতিবাসীবর্গকে জানাইতে হইত। তাঁহারা ক্রয় করিতে অস্বীকৃত হইলে পর, বাহিরের লোক ক্রেতা হইতে পারিতেন। বোধ হয়, একেবারে অজানা বাহিরের লোক যাহাতে পাড়ায় না আসিয়া পড়ে, সেই জন্য এই ব্যবস্থা ছিল। এইরূপ Law of pre-emption অন্যান্য জাতির মধ্যেও দেখা যায়।

পরিবার (Family)

এখনকার দিনের ন্যায় তখনও (অবশ্য আমরা অর্থশাস্ত্র প্রভৃতিতে যাহা পাই) সাধারণতঃ গৃহস্বামী ও তাঁহার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও তৎসন্ততি লইয়াই পরিবার গঠিত হইত।

গৃহস্বামীর জীবদ্দশায় তিনিই সংসারের কর্ত্তৃত্ব করিতেন। তাঁহার পুত্রেরা তাঁহার জীবৎকালে তাঁহার সম্পত্তিতে অনীশ্বর ও অংশবঞ্চিত বলিয়াই বিবেচিত হইতেন (অনীশ্বরাঃ পিতৃমন্তঃ—পৃঃ ১৬০)। তিনি জীবদ্দশায় পুত্রাদির বিবাহ দিতেন। সাংসারিক বিষয়ে স্ত্রী-ই কর্ত্তৃত্ব করিতেন। সংসারের জন্য তিনি ঋণ-কর্জ্জ করিলে, স্বামী উহা দিতে আইন-অনুসারে বাধ্য হইতেন। বহু স্ত্রী স্থলে সবর্ণা পুত্রবতী ও জ্যেষ্ঠাই কর্ত্তৃত্ব করিতেন।

অর্থশাস্ত্র ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থ পাঠ করিলে যাহা বুঝা যায়, তাহাতে আমাদের বোধ হয় যে, যৌথপরিবারের সংখ্যা সমাজে বড় বেশী ছিল না। অবশ্য কৃষক, শিল্পী ও কারুকার্য্যজীবী প্রভৃতির কথা স্বতন্ত্র, ইহারা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পরস্পরের সাহায্যাপেক্ষী হইয়া বাস করিত, তজ্জন্য বোধ হয়, ইহাদের মধ্যে যৌথপরিবারের স্থায়িত্ব অধিক ছিল।

ভদ্রগৃহস্থের মধ্যে সাধারণতঃ পিতার মৃত্যুর পরই সম্পত্তি বিভাগের ব্যবস্থা দেখা যায়। তবে ইহাতে যে যৌথপরিবার একেবারে ছিল না, তাহার প্রমাণ হয় না। বরং দেখা যায় যে, স্থলবিশেষে দুই তিন ভ্রাতা বা কয়েক ভ্রাতা ও অন্য ভ্রাতার পুত্রেরা একত্র বাসও করিতেন জাতকে দুই তিন ভ্রাতার একত্রাবস্থানের বহু উদাহরণ আছে। সংসারে পরিবার-ভুক্ত আত্মীয়স্বজন ভিন্ন দাসদাসী, আশ্রিতবর্গ ও অন্য পরিজনেরও স্থান ছিল। যথাসময়ে উহাদের বিষয় বর্ণিত হইবে।

বিবাহ ও গার্হস্থ্যজীবন

অর্থশাস্ত্রের বর্ণনায় বুঝা যায় যে, সাধারণতঃ লোকে ষোড়শ বৎসরের পর শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া গো দান-সংস্কারের পর বিবাহ করিত। বৌধায়ন-বশিষ্ঠাদি ধর্ম্মসূত্রে, এমন কি মনুসংহিতার মতে ব্রহ্মচর্য্যের কাল আরও অধিকদিনব্যাপী ছিল।

বিবাহের বয়স

বৌধায়ন ব্রাহ্মণের পক্ষে ৪৮ বৎসর পর্য্যন্ত বৈদিক ব্রহ্মচর্য্যের কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন অন্য স্থলে আবার ৩৭ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যের কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মনু বিবাহের বয়স সম্বন্ধে যে দুই তিনটি উদাহরণ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতেও দেখা যায় যে, তাঁহার মতে ৩০ বা ন্যূনকল্পে ২৪ বৎসর, পুরুষের পক্ষে বিবাহের প্রকৃষ্ট বয়স। বিবাহের উদাহরণ স্থলে মনু বলেন,—

> ত্রিংশদ্বর্ষোবহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং।
> ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাং বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ॥ মনু ৯।৯৪

আমাদের চক্ষে স্মৃতিকারের মতগুলি উচ্চ আদর্শানুযায়ী বলিয়াই বোধ হয়। সমাজে ঐ মত কার্য্য হইত বলিয়া বোধ হয় না। রামচন্দ্রের বিবাহ বোধ হয় ষোড়শ বর্ষেই হইয়াছিল। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডবের বিবাহও ঐরূপ কম বয়সেই হইয়াছিল ভগবান্ বুদ্ধও বিবাহ করিয়

কি না করিব—এই চিন্তায় কালক্ষেপ করিয়া ২৩ বৎসর বয়সে বিবাহ করিয়াছিলেন। সাধারণ গৃহস্থেরাও ঐরূপ অল্পবয়সে বিবাহ করিতেন বলিয়াই মনে হয়। কৌটিল্য এ সম্বন্ধে স্পষ্টই বলেন,—"বৃত্তোপনয়নস্ত্রয়ীম্ আন্বীক্ষকীং চ শিষ্টেভ্যঃ, বার্ত্তামধ্যক্ষেভ্যঃ, দণ্ডনীতিং বক্তৃপ্রয়োক্তৃভ্যঃ। ব্রহ্মচর্য্যং চাষোড়শাদ্বর্ষাৎ। অতো গোদানং দারকর্ম্ম চ।"—১০ পৃঃ।

অর্থশাস্ত্রে অষ্ট প্রকার বিবাহের উল্লেখ আছে। এই অষ্ট প্রকার বিবাহের উল্লেখ মন্বাদি স্মৃতি ও পরবর্ত্তী নিবন্ধমাত্রেই পাওয়া যায়। কৌটিল্য এই অষ্ট প্রকার বিবাহের প্রথম চারিটি, অর্থাৎ ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, আর্ষ, দৈব এই চারিটিকে অন্য চারি প্রকার বিবাহ হইতে বিভিন্ন করিয়াছেন। তিনি এই চারিটিকে ধর্ম্ম্য বিবাহ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, এই চারিটি বিবাহই ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে সম্পাদিত হইত এবং ইহাতে বর-কন্যার পিতার কর্ত্তৃত্ব থাকিত।

অপর চারিটি বিবাহ, অর্থাৎ গান্ধর্ব্ব, আসুর, রাক্ষস ও পৈশাচ—এই কয়টীকে কৌটিল্য কোন নামে অভিহিত করেন নাই। আমরা ইহাদিগকে মানুষ বা লৌকিক বিবাহ বলিতে পারি। গান্ধর্ব্ব বিবাহ সাধারণতঃ ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। বর ও কন্যার পরস্পরের ইচ্ছায় যে সম্বন্ধ স্থাপিত হইত, তাহাকে গান্ধর্ব্ব বিবাহ বলিত। গান্ধর্ব্বের উদাহরণ প্রাচীন ইতিহাস পুরাণাদিতে অনেকই দেখা যায়। স্মৃতিকার-দিগের মতে ইহা ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যেই বিশেষ আদৃত হইত। আসুর বিবাহে কন্যাপক্ষ বরের নিকট হইতে পণগ্রহণ করিতেন। রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহকে আধুনিক হিন্দু আদর্শে বিবাহই বলা যাইতে পারে না। বলপ্রয়োগে কন্যা হরণ করিয়া বিবাহ করাকে রাক্ষস বিবাহ বলিত। রাক্ষস বিবাহ ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে নিন্দিত ছিল না, পরন্তু উহার বিলক্ষণ সমাদর ছিল। মহাভারতে ঐরূপ বীর্য্যশুল্কা কন্যার বিবাহের ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে। স্বয়ং কুরু-পিতামহ ভীষ্ম বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের জন্য অম্বা, অম্বালিকা ও অম্বিকাকে হরণ করেন

পৈশাচ বিবাহ আরও ঘৃণিত ছিল। সুপ্তা বা প্রমত্তা কন্যাকে

বলপূর্ব্বক ভোগ করিলে, উভয়ের যে সংযোগ হইত, তাহাকেই পৈশাচ বিবাহ বলিত।

বর্ত্তমানে আমাদের ধারণায় শেষোক্ত বিবাহ কয়টীর কোনটীই বিবাহ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। প্রাচীন আদর্শ হইতে এ যুগের আদর্শ একেবারেই বিভিন্ন হইয়াছে। এক হিসাবে বলিতে গেলে প্রাচীন আদর্শ উদারও ছিল। এই উদারতার ফলে স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধমাত্রই বিবাহ বলিয়া গণিত হইত এবং সেকালের নীতিকারেরা বা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকেরা বলে বা ছলে উপভোগকারীকে উপভুক্তা রমণীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিতে বাধ্য করিতেন; ফলে ঐ স্ত্রীলোকের ও তাহার গর্ভজাত সন্তানের সামাজিক ও আর্থিক কোন কষ্টের বা হীনতার সম্ভাবনা হইত না। ফলে এক হিসাবে সমাজের অবশ্য মঙ্গলই হইত।

বর্ত্তমানে অবশ্য ব্রাহ্ম ও আসুর ভিন্ন অন্যপ্রকারের বিবাহ হিন্দুসমাজে চলিত নাই। ব্রাহ্ম বিবাহ উচ্চবর্ণের হিন্দুমাত্রের মধ্যে প্রচলিত। তবে বর্ত্তমানের ব্রাহ্ম বিবাহেও একপ্রকার আসুরিকতা আসিয়াছে। এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় কন্যাকর্ত্তার ইচ্ছামত আভরণাদি দান করিয়া কন্যা-সম্প্রদান করা হয় না। এখন বরপক্ষ অযথা পণের দাবি করিয়া নিজেদের আসুরিকতার পরিচয় দেন। এতদ্ভিন্ন সেকালের আসুর বিবাহ, অর্থাৎ কন্যার পিতাকে শুল্ক বা কন্যার মূল্যস্বরূপ অর্থ দিয়া কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহ, বর্ত্তমানে নিম্নশ্রেণীর অনেক হিন্দুর মধ্যে প্রচলিত। প্রাচীন সমাজমাত্রেই এবং বর্ত্তমানের অনেক অসভ্যসমাজে এইরূপ পণদ্বারা কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহ প্রচলিত আছে। অনেক ইউরোপীয়ের মতে ইহা Marriage by purchase বলিয়া অভিহিত। রাক্ষস বিবাহ এখনও পৃথিবীর অনেক অসভ্য জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে। ইহাকে Marriage by capture বলা হয়।

ধর্ম্ম্য বিবাহ ও লৌকিক বিবাহের পার্থক্যের অনেকগুলি কারণ ছিল। প্রথমতঃ ধর্ম্ম্য বিবাহ যাবজ্জীবন স্থায়ী বলিয়া পরিগণিত হইত এবং উহাতে মোক্ষ বা বিচ্ছেদের—ইংরাজীতে যাহাকে আমরা Divorce

বলি তাহার ব্যবস্থা ছিল না। কৌটিল্য বলেন,—অমোক্ষো ধর্ম্ম-বিবাহানাম্।

দ্বিতীয়তঃ ধর্ম্ম্য বিবাহের সন্তানসন্ততির অর্থাৎ পুত্রের, তদভাবে কন্যার—উত্তরাধিকার-সূত্রে সম্পত্তিহরণে প্রাশস্ত্য ছিল। (পুত্রবতঃ পুত্রাঃ দুহিতরো বা ধর্ম্মিষ্ঠেষু বিবাহেষু জাতাঃ)। তদভাবেই কেবল অন্য বিবাহে উৎপন্ন সন্তানেরা দায়াদ হইতে পারিত।

লৌকিক বিবাহগুলি বর্ত্তমানের Contract marriage এর মত ছিল। উভয় পক্ষ পরস্পর পরস্পরের বিদ্বেষী হইলে বা বিবাহ বন্ধনচ্ছেদে কৃতসংকল্প হইলে, বিবাহের মোক্ষ অর্থাৎ Dissolution of marriage হইত। কেবল একপক্ষ মাত্র বিবাহবন্ধন রক্ষণে যত্নবান্ থাকিলেও বিচ্ছেদ হইত না। কৌটিল্য বলেন,—"অমোক্ষ্যা ভর্ত্তুরকামস্য দ্বিষতী ভার্য্যা, ভার্য্যায়াশ্চ ভর্ত্তা পরস্পরং দ্বেষান্মোক্ষঃ" (কৌ—১৫৫ পৃষ্ঠা)।

শুধু বিবাহবন্ধনচ্ছেদ ভিন্ন এ বিবাহগুলিতে সম্পত্তির পক্ষে আরও কতকগুলি নিয়ম ছিল। এই সকল বিবাহে স্বামীদত্ত শুল্ক বা স্ত্রীধন ভর্ত্তা নিজে বিপৎকালে ভোগ করিতে পারিতেন না। ভোগ বা ব্যয় করিলে গান্ধর্ব ও আসুর স্থলে তাঁহাকে সুদসমেত উহা প্রত্যর্পণ করিতে হইত। আবার রাক্ষস ও পৈশাচ স্থলে ভর্ত্তার পক্ষে ঐরূপ শুল্কের ব্যয় করা চৌর্য্য বলিয়া পরিগণিত হইত।

বহুবিবাহ

পুরুষের পক্ষে বহুবিবাহ আইন-অনুসারে একেবারে নিষিদ্ধ ছিল না। তবে ইচ্ছামত অনেকগুলি বিবাহের পক্ষে আইনে প্রতিরোধক বাধা অনেক ছিল। স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে বা কেবল উপর্য্যুপরি কন্যা-জননী হইলেই আইনমতে পুরুষ পুনর্বিবাহের অধিকার লাভ করিতেন। কৌটিল্য বলেন,—"বর্ষাণ্যষ্টৌ অপ্রজায়মানাম অপুত্রাং বন্ধ্যাং চাকাঙ্ক্ষেত। দশ বিন্দুং দ্বাদশ কন্যা-প্রসবিনীম। ততঃ পুত্রার্থী দ্বিতীয়াং বিন্দেত।" অর্থাৎ পত্নী বন্ধ্যা ও অপ্রজায়মানা হইলে স্বামী আট বৎসর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবেন।

বিবাহের পর কেবল একটি মাত্র সন্তান হইয়া উহা মরিয়া গেলে, স্বামীকে দশ বৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে। আর উপর্য্যুপরি কেবল কন্যাসন্তান-মাত্র হইলে স্বামী দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবেন। অতঃপর পুত্রলাভার্থ দ্বিতীয়া পত্নী গ্রহণ করিতে পারিবেন।

এইরূপ নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে ভর্ত্তা আইন অনুসারে ২৪ পণ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

কামবশে বহুবিবাহ করিলে কেবল অর্থদণ্ড দিয়াই ভর্ত্তার নিষ্কৃতি ছিল না। তাঁহাকে পূর্ব্ববিবাহিতা পত্নীর সান্ত্বনার্থ আধিবেদনিক শুল্ক অর্থাৎ Compensation দিতে হইত।

ফলতঃ আমাদের মনে হয় যে, সাধারণ লোকের পক্ষে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ না হইলেও, অর্থদণ্ডের ভয়ে ও স্ত্রীর আধিবেদনিক শুল্কদানের ফলে দরিদ্র মধ্যবিত্ত লোক প্রায়শঃই বহুবিবাহে বিরত থাকিতেন। তবে ধনী লোকের, রাজা বা উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীদিগের কথা স্বতন্ত্র ছিল। তাঁহাদের পক্ষে সামান্য অর্থদণ্ড বা আধিবেদনিক শুল্কদান কিছুই ছিল না। তাঁহারা ইচ্ছামত বহুবিবাহ করিতেন। আর রাজাদিগের ত কথাই ছিল না। মৌর্য্য ও মৌর্য্যপূর্ব্ব যুগের সকল রাজারই বোধ হয় বহু স্ত্রী ছিল। বুদ্ধের সময় কোশলরাজ প্রসেনজিতের একাধিক স্ত্রীর উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি বিবাহিতা পত্নী ভিন্ন মল্লিকা নাম্নী এক ফুলওয়ালীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। পরে আবার শাক্যবংশীয়া দাসী-গর্ভজাতা বাসবক্ষত্রিয়াকে বিবাহ করেন। মগধরাজ বিম্বিসার, অজাতশত্রু, মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত, অশোক প্রভৃতি সকলেই বহুপত্নীক ছিলেন। অর্থশাস্ত্রের নিশান্তপ্রণিধি অধ্যায়ে দেখা যায় যে, প্রায় সকল রাজারই বহু পত্নী ও বহু উপপত্নী থাকিত। উহাদের চক্রান্তের ফলে রাজাকে প্রাণের জন্য সর্ব্বদাই সাবধানে থাকিতে হইত। এমন কি, প্রধানা পত্নী দেবীপদবাচ্যা মহারাণীকেও সম্রাট্ বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। রাজান্তঃপুর বৃদ্ধ রক্ষিপুরুষ ও স্ত্রীজাতীয় রক্ষীদিগের দ্বারা সততই রক্ষিত হইত।

দাম্পত্যজীবন

বিবাহের সময় স্বামী স্ত্রীকে যথাশক্তি অলঙ্কারাদি দিতেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে স্ত্রীর বৃত্তিস্বরূপ কিছু অর্থও দিতে হইত। অলঙ্কারের সম্বন্ধে কোন নিয়ম ছিল না। যাঁহার যেমন অবস্থা, তিনি স্ত্রীকে সেইরূপই দিতেন। বৃত্তির সম্বন্ধে নিয়ম ছিল, উহা দুই সহস্র পণের কম হইত না। কৌটিল্য বলেন,—"আবন্ধ্যানিয়মঃ। পরদ্বিসহস্রা স্থাপ্যা বৃত্তিঃ।" এই বৃত্তি ও লৌকিক বিবাহে কন্যা যে শুল্ক পাইতেন, তাহা স্ত্রীর নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত। স্বামী কোনরূপ ব্যবস্থা না করিয়া প্রবাসে গেলে বা কোন কারণে উপায়াক্ষম হইলে, এই স্ত্রীধনই স্ত্রীর জীবিকা নির্ব্বাহের সহায়তা করিত। ইহাতে স্বামীর কোন প্রকার স্বত্ব বা অধিকার থাকিত না। দম্পতী ধর্ম্ম্য বিবাহে আবদ্ধ হইলে, অর্থাভাববশতঃ বা বিপৎকালে স্বামী এই স্ত্রীধন ব্যয় করিতে পারিতেন। কিন্তু লৌকিক বিবাহে এইরূপ স্ত্রীধন ব্যয় দোষের ছিল। স্বামীকে উহা সুদেমূলে প্রত্যর্পণ করিতে হইত। রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহ স্থলে উহা স্তেয় বা চৌর্য্য বলিয়া গণ্য হইত। "গান্ধর্ব্বাসুরোপভুক্তং সবৃদ্ধিকমুভয়ং দাপ্যেত রাক্ষসপৈশাচোপভুক্তং স্তেয়ং দদ্যাৎ।"—১৫২ পৃষ্ঠা।

স্ত্রীধন

দ্বাদশ বৎসর বয়স হইলেই স্ত্রী প্রাপ্তব্যবহারা অর্থাৎ স্বামিসহবাসের উপযুক্তা বলিয়া পরিগণিত হইতেন। এই দ্বাদশ বৎসরের পর তাঁহাকে স্বামীর ঘর করিতে হইত। এই দ্বাদশ বৎসরকে আমরা তৎকালের Age of consent বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। ইহার পর স্ত্রী স্বামীর ঘর করিতে বা স্বামীর সেবা করিতে অস্বীকৃতা হইলে, তিনি অর্থদণ্ডে দণ্ডিতা হইতেন। স্বামীরও ঐরূপ ষোড়শ বৎসরের পর স্ত্রীর প্রতিপালনাদি না করিলে তাঁহার অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল।

সংসার—স্ত্রীর স্বামীসেবা পোষ-পোষণ বা ভরণ-পোষণে স্বামীর দায়িত্ব।

স্বামীকে নিজের অবস্থানুযায়ী সাধ্যমত স্ত্রীর ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিতে হইত। কাল বা সময়ের হিসাব করিয়া তদুপযোগী অর্থ দিতে হইত (প্রবাসাদি গমনস্থলে); অথবা স্বামীর আয় অনুযায়ী মাসহারার ব্যবস্থা করিতে হইত (যথাপুরুষপরিবাপম্)। শুল্ক, স্ত্রীধন ও আধিবেদনিক ধনদানে অসমর্থ হইলেও ঐরূপ মাসহারার ব্যবস্থা করিতে হইত। (অ° শা°—১৫৪ পৃ°)

কিন্তু স্ত্রী যদি শ্বশুরকুলের অন্য কাহারও আশ্রয় অবলম্বন করিতেন কিংবা বিবাদাদিবশতঃ স্বামীর আশ্রয় ত্যাগ করিয়া ভিন্নভাবে বাস করিতেন (বিভক্তায়াঃ), তাহা হইলে তাঁহার স্বামীর উপর খোরাকীর কোন দাবী থাকিত না (শ্বশুরকুলপ্রবিষ্টায়াঃ বিভক্তায়াং বা নাভিযোজ্যঃ পতিঃ)।

স্ত্রীর উপর স্বামীর যথেষ্ট কর্তৃত্ব ছিল। স্ত্রী অবাধ্যা বা অবশতাপন্না হইলে কিংবা স্বামীর আদেশ অবমাননা করিলে স্বামী তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে, এমন কি কটুসম্ভাষণাদি করিতে পারিতেন;

স্বামীর শাসন ও কর্তৃত্ব

উদাহরণস্বরূপ কৌটিল্য বলেন যে, স্বামী অপরাধিনী স্ত্রীকে নগ্না, বিনগ্না, ন্যঙ্গা, অপিতৃকা এবং অমাতৃকা বলিয়া গালি দিতে পারিতেন (নগ্নে বিনগ্নে ন্যঙ্গে অপিতৃকে অমাতৃকে ইত্যনির্দ্দেশেন বিনয়গ্রাহণম্)। তাহাতেও স্ত্রীর মতিগতির পরিবর্তন না হইলে, স্বামী চড়চাপড় কিংবা বেণুদল বা রজ্জুর দ্বারা স্ত্রীকে প্রহার করিতে পারিতেন। অকারণ প্রহার করিলে কিংবা শাসনের মাত্রা অধিক হইলে, স্ত্রীর প্রতি অতিরিক্ত অত্যাচারের জন্য স্বামীকে বাক্পারুষ্য বা দণ্ডপারুষ্যের অর্দ্ধেক দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইত। (বেণুদলরজ্জুহস্তানামন্যতমেন বা পৃষ্ঠে ত্রিরাঘাতঃ। তস্যাতিক্রমে বাগ্দণ্ডপারুষ্যদণ্ডাভ্যাম্ অর্দ্ধদণ্ডাঃ—১৫৫পৃ°।) কতকগুলি অপরাধে স্ত্রীলোকের অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। কৌটিল্যের শাস্ত্রে অর্থদণ্ডের নিয়মগুলি দেখিলে বোধ হয়, দণ্ডিতা স্ত্রীকে নিজের স্ত্রীধন হইতেই উহা দিতে হইত। নিম্নে উহার কতিপয় নিয়ম উদ্ধৃত হইল:—

১। স্বামীর নিষেধ সত্ত্বেও স্ত্রী দর্পক্রীড়া (কামকলাব্যাপারঘটিত

কোন প্রকার ক্রীড়া) করিলে বা মদ্যপান করিলে উহাকে তিন পণ অর্থদণ্ড দিতে হইত।

২। ঐরূপ দিনমানে স্বামীর নিষেধ সত্ত্বেও কেহ স্ত্রী-প্রেক্ষাবিহারে গমন করিলে অর্থাৎ নটীদিগের দ্বারা পরিচালিত কোন প্রকার থিয়েটারাদি দেখিতে গেলে, তাহার ছয় পণ দণ্ড হইত। রাত্রিতে বাটীর বাহির হইলে বা কোন উৎসবাদিতে গমন করিলে কিংবা পুরুষ-পরিচালিত কোন থিয়েটারাদিতে গেলে, অধিক অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। ঐরূপ অন্য কোন পুরুষের সহিত পত্রব্যবহার করিলে বা দ্রব্যাদির দানপ্রদান করিলে (প্রতিষিদ্ধপুরুষব্যবহারেষু) স্ত্রীলোকদিগকে দণ্ডিত হইতে হইত। ব্যভিচারাদি স্থলে আরও অধিক কঠোর দণ্ড হইত; সে বিষয়ে পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বলা হইবে।

বিবাহিতা নারীর সাধারণতঃ বাটীর বাহিরে যাওয়া সমাজে নিন্দিত ছিল। এখনকার দিনের মত কঠোর অবরোধ না থাকিলেও, যেখানে সেখানে বেড়াইতে যাওয়া, নিজের বাটী ছাড়িয়া প্রতিবেশীর গৃহে গমন করা প্রভৃতি বিশেষ দোষের ছিল। অর্থশাস্ত্রের নিষ্পতন ও পথানুসরণাধ্যায়ে এই সমস্ত অপরাধ ও উহার দণ্ডের কথা বিবৃত আছে।

উচ্চবংশীয়া মহিলারা কোন কার্য্যে গ্রামান্তর-গমনের সময় স্বামিসঙ্গে অথবা কোন জ্ঞাতি বা কোন বিশেষ পরিচিত লোককে সঙ্গে করিয়া যাইতেন, নচেৎ উহা নিন্দার কারণ হইত। আত্মীয়স্বজনের কিংবা পিতৃকুলে বা জ্ঞাতিকুলে কাহারও কোন বিপদ হইলে, অথবা কাহারও মৃত্যু হইলে, কেহ কঠিন রোগে পড়িলে বা অন্য কোন বিশেষ কারণবশতঃ স্ত্রীলোকের একাকী প্রবাস গমন দোষের বলিয়া গণ্য হইত না (প্রেতব্যাধিব্যসনগর্ভনিমিত্তমপ্রতিষিদ্ধমেব জ্ঞাতিকুলগমনম্—১৫৭ পৃঃ)।

স্বামীর প্রবাস-গমন

স্বামী অল্প দিনের জন্য প্রবাস গমন করিলে স্ত্রীর ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিয়া যাইতেন। ফিরিতে বিলম্ব হইলে স্ত্রী এক বৎসর পর্য্যন্ত পতিগৃহে স্বামীর অপেক্ষা করিতেন। আর যদি ভরণপোষণের সুব্যবস্থা থাকিত, তাহা হইলে দুই

বৎসর পর্য্যন্ত পতিগৃহে থাকিয়া পতির অপেক্ষা করার নিয়ম ছিল। ইহার মধ্যেও যদি স্বামী না ফিরিয়া আসিতেন, তাহা হইলে জ্ঞাতিবর্গ প্রবাসীর পত্নীকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন ; এইরূপ চারি বা আট বৎসর অতীত হইলে, স্ত্রী যদি স্বামীর পুনরাগমনে সন্দিহান হইয়া পুরুষান্তর-গ্রহণেচ্ছু হইতেন, তাহা হইলে তিনি স্বামি দত্ত ধনাদি প্রত্যর্পণ করিয়া যথেচ্ছ পিতৃগৃহে বা অন্য কোথাও চলিয়া যাইতে পারিতেন।

প্রবাসীর স্ত্রীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অর্থশাস্ত্রে বিশেষ কিছু বলা নাই। কাব্য-নাটকাদিতে অবশ্য আমরা একবেণীধরা, কেশসংস্কার ও অঙ্গরাগ-বর্জ্জিতা প্রোষিতভর্ত্তৃকার কথা পাই ; তাহা সংস্কৃত কাব্য নাটকাদি পাঠকমাত্রেই বিদিত আছেন।

দীর্ঘপ্রবাস

স্বামীর প্রবাসগমনের সময়ে নিজের বা পুত্র-কন্যার ভরণপোষণের জন্য স্ত্রী ঋণ গ্রহণ করিয়া সংসার চালাইতে পারিতেন। এই ঋণ-পরিশোধের জন্য স্বামী দায়ী হইতেন। কৌটিল্য বলেন, "পতিস্তু গ্রাহ্যঃ। স্ত্রীকৃতম্ ঋণম্ অপ্রতিবিধায় প্রোষিতঃ ইতি সম্প্রতিপত্তাবুত্তমঃ। অসম্প্রতিপত্তৌ তু সাক্ষিণঃ প্রমাণম্।"

স্বামী ভরণপোষণের দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টা করিলে রাজাদেশে দণ্ডিত হইতেন এ সম্বন্ধে অর্থশাস্ত্রের বিধিগুলি বড়ই সুন্দর। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ যে সকল কর্ত্তব্য ছিল, তিনি তাহা প্রতিপালনে বিমুখ হইলে সমাজের অমঙ্গলাশঙ্কায় রাজপুরুষেরা কঠোর শাসনে তাঁহাকে উহা হইতে বিরত করিতেন। অর্থশাস্ত্রের যুগ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের পরবর্ত্তী। ঐ যুগের লোকে পৃথিবীর ক্ষণিকতাবাদে বাধিত হইয়া ও নশ্বর জীবনের দুঃখ ও পৌনঃপুনিক জন্মমৃত্যুর হাত হইতে অব্যাহতিলাভের জন্য দলে দলে সন্ন্যাসী হইত। স্বামী স্ত্রীকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইত, স্ত্রীও ভিক্ষুণী সঙ্ঘে প্রবেশ করিত। এই সকলের মধ্যে প্রকৃত মুমুক্ষুর সংখ্যা কম ছিল, কতক লোক অন্যের আদর্শ অনুকরণ করিতে গিয়া গার্হস্থ্যধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিত।

আবার এখনকার মত অনেক দুষ্ট প্রবঞ্চক ধর্ম্মের ভাণ করিয়া, অথবা সংসারের দায়িত্ব এড়াইবার জন্য, ভিন্ন ভিন্ন সঙ্ঘের কোন একটিতে যোগ দিত। এই সকলের ফলে সমাজে বিশেষ বিশৃঙ্খলা ঘটিত। অনেক ভদ্রঘরের স্ত্রী স্বামি-কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া শিশু-পুত্রাদির ভরণপোষণের জন্য বিপদে পড়িতেন; অনেকে আবার কুপথগামিনী হইতেন। এই সকল নিবারণের জন্য অর্থশাস্ত্রে অনেকগুলি বিধি দেখা যায়।

অর্থশাস্ত্রকার প্রব্রজ্যার কালনির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন ও প্রব্রজ্যা-গ্রহণের পূর্ব্বে যে সকল কর্ত্তব্য, তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে লুপ্তব্যবায়েরই প্রব্রজ্যা-গ্রহণ কর্ত্তব্য, অন্যের নহে। তিনি বলেন,—"লুপ্তব্যবায়ঃ প্রব্রজেদ্ আপৃচ্ছ্য ধর্ম্মস্থান্। অন্যথা নিয়ম্যেত" (৪৮ পৃ°)। শুধু তাহাই নহে। পুত্র-কলত্রের ভরণপোষণ না করিয়া সংসারত্যাগ করিলে লোকে রাজাদেশে দণ্ডিত হইত। কৌটিল্য বলেন,—"পুত্রদার-মপ্রতিবিধায় প্রব্রজতঃ পূর্ব্বসাহসদণ্ডঃ" (৪৮ পৃ°)। এ বিষয়ে রাজাদেশ বড়ই কঠিন ছিল। এরূপ কাষ্ঠবৈরাগী প্রব্রজিতকে নাবধ্যক্ষ ও অন্যান্য শান্তিরক্ষকেরা গ্রেপ্তার করিতেন এবং উহাদের সংসারাদির ব্যবস্থা ও প্রব্রজ্যার কারণ অবগত হইয়া যথাযথ দণ্ড দিতেন। (সদ্যোগৃহীতলিঙ্গিনম্ অলিঙ্গিনং বা প্রব্রজিতমলক্ষ্যব্যাধিতং ভয়বিকারিণং গূঢ়সারভাণ্ডশাসন-শস্ত্রাগ্নিযোগং বিষহস্তং দীর্ঘপথিকং মমুদ্রং চোপগ্রাহয়েৎ।—১২৭ পৃ°)

শুধু তাহাই নহে, রাজাজ্ঞায় অকারণ-প্রব্রজিতদিগের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইত এবং বানপ্রস্থী ভিন্ন অন্য প্রকারের প্রব্রজিতদিগকে সঙ্ঘাদি স্থাপন করিতে বা গ্রাম-নগরে বাস করিতে দেওয়া হইত না। স্ত্রীলোককে ধর্ম্মের নামে ফুসলাইয়া ভিক্ষুণী করিলে বা প্রব্রজ্যার পথে লইয়া আসিলে, পূর্ব্বসাহসদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। ("স্ত্রিয়ং চ প্রব্রাজয়তঃ" এবং "বানপ্রস্থাদন্যঃ প্রব্রজিতভাবঃ সজাতাদন্যঃ সঙ্ঘঃ সামুত্থায়িকাদন্যঃ সময়ানুবন্ধো বা নাস্য জনপদমুপনিবেশেত। ন চ তত্রারামবিহারার্থাঃ শালাঃ স্যুঃ।—৪৮ পৃ°)

এই ত গেল স্বামী-স্ত্রীর কথা। স্বামীর জীবনান্তে বা বান-প্রস্থাবলম্বনের পর পুত্রবতী বয়ঃস্থা স্ত্রী স্বামীর সংসারে থাকিয়া পুত্রাদি পালন করিতেন। তিনি নিজের স্ত্রীধন যাবজ্জীবন ভোগ করিতেন; পরে তাহা পুত্রকন্যাদের কাহারও হস্তগত হইত। বাল-বিধবারা প্রায়ই পুরুষান্তর গ্রহণ করিতেন। পরবর্তী অধ্যায়ে সে সব কথা বলা হইবে।

যে সকল পরিবারে বহুবিবাহের ফলে অনেক সপত্নীর একত্রাবস্থান হইত, সেখানে নানাকারণে কলহ হইত। স্বামী সাধারণতঃ জীবৎ-পুত্রাকে বেশী আদর-যত্ন করিতেন। ধর্ম্যাবিবাহের পত্নীদের মান্য অধিক ছিল। ধর্ম্মশাস্ত্রাদির মতে ধর্ম্মকার্য্যাদিতে সবর্ণা (ধর্ম্যাবিবাহ-মতে পরিণীতা) স্ত্রী স্বামীর সাহচর্য্য করিতেন।

অনেকে আবার অসবর্ণা স্ত্রী বিবাহ করিতেন। অসবর্ণবিবাহ তৎকালে সমাজে প্রচলিত ছিল। অনুলোম অসবর্ণবিবাহ গর্হিত বা নিন্দিত ছিল না। কিন্তু প্রতিলোম বিবাহ কেবল আর্য্যেরা কেন, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই লোকে চিরকাল ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছেন। অর্থশাস্ত্রে অসবর্ণবিবাহের কতকগুলি নিয়ম দেখা যায়। পুরুষের অনন্তরা পত্নীর সন্তানেরা পিতার সবর্ণ বলিয়া গণ্য হইতেন, অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান ও ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যাগর্ভজাত সন্তান পিতার সামাজিক মর্য্যাদার অধিকারী হইতেন এবং সবর্ণ বলিয়াই পরিগণিত হইতেন (ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়য়োরনন্তরাপুত্রাঃ সবর্ণাঃ)। একান্তরা পত্নীর গর্ভজাত সন্তানদের স্থান সমাজে কিছু হীন হইয়া পড়িয়াছিল। পতির সংসারেও বোধ হয় অসবর্ণা নিম্ন-জাতীয়া স্ত্রীর কিছু হীনতা ছিল।

অসবর্ণা স্ত্রী

স্বামি-স্ত্রী জীবদ্দশায় পুত্রকন্যাদিগের বিবাহ দিতেন। পিতা সংসারে থাকিতে থাকিতে যাহাদের বিবাহ না হইত, তিনি নিজের সম্পত্তি হইতে তাহাদের বিবাহের খরচ ও অবিবাহিতা কন্যাদের বিবাহের প্রদানিক (dower) দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন।

অনেকে জীবদ্দশাতেই নিজ নিজ সম্পত্তি পুত্রদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়া যাইতেন। এরূপ বিভাগস্থলে পুত্রদের সমান ভাগ হইত (জীবদ্বিভাগে পিতা নৈকং বিশেষয়েৎ।—১৬১ পৃ°)। পুত্রদিগের মধ্যে নাবালক কেহ থাকিলে বা কেহ প্রবাসী থাকিলে পিতা তাহার অংশ মাতুলবংশীয়দের বা গ্রামবৃদ্ধদিগের হস্তে অর্পণ করিয়া যাইতেন। ঐ পুত্র সাবালক হইলে, ইঁহারা উঁহার অংশ বুঝাইয়া দিতেন।

ঔরসজাত পুত্র অভাবে অনেকে অন্যের দ্বারা নিজ স্ত্রীতে ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপন্ন করাইতেন। অর্থশাস্ত্রের সময়েও বোধ হয় ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদনের প্রথা সমাজে অপ্রচলিত ছিল না। এখনকার দিনে অবশ্য ক্ষেত্রজের নামে আপামর জনসাধারণ ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন, কিন্তু সে যুগে উহা ঘৃণার চক্ষে দেখা হইত না। কৌটিল্য অপুত্রক রাজগণকে ঔপদাভাবে ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদনের উপদেশ দিয়াছেন। (বৃদ্ধস্তু ব্যাধিতো বা রাজা মাতৃবন্ধুকুল্যগুণবৎ-সামন্তানামন্যতমেন ক্ষেত্রে বীজমুৎপাদয়েৎ। ন চৈকপুত্রমবিনীতং রাজ্যে স্থাপয়েৎ।—৩৫ পৃ°)

অনেকে দুহিতৃ গর্ভজাত সন্তানকে পুত্রিকাপুত্ররূপে গ্রহণ করিতেন। কেহ কেহ আবার পোষ্যপুত্র বা দত্তক গ্রহণ করিতেন (তৎসধর্ম্মা মাতা পিতৃভ্যাম অদ্ভির্দত্তো দত্তঃ)। অনেকে এইরূপ দত্তকের অভাবে সবর্ণ ও সদ্বংশজাত পুত্র ক্রয় করিতেন। এইরূপ পুত্রকে ক্রীতপুত্র বলা হইত। কেহ কেহ পরের (মাতা-পিতৃহীন) পুত্রকে পোষ্যপুত্রের ন্যায় লালন-পালন করিতেন; ইহাদিগকে কৃতকপুত্র বলিত। অনেকে আবার পরিচিত বা আত্মীয় লোকের ত্যক্ত পুত্রকে নিজের করিয়া লইতেন; ইহাদিগকে অপবিদ্ধপুত্র বলা হইত। এ সকলের অভাবে কানীন ("কন্যাগর্ভঃ কানীনঃ"—পত্নীর অবিবাহিতাবস্থায় উৎপন্ন), সহোঢ় (বিবাহকালে পত্নীর গর্ভস্থ সন্তান) ও পৌনর্ভব সন্তানও লোকের গৃহে স্থান পাইত। এখন অবশ্য পালিত বা পোষ্যপুত্র (এবং স্থানবিশেষে

কৃত্রিম পুত্র) ভিন্ন আর অন্ত কোন প্রকার পুত্রের দায়াধিকার বা সমাজে স্থান নাই।

পিতার জীবদ্দশায় (পিতার স্বোপার্জ্জিত ?) সম্পত্তিতে পুত্রদিগের কোন অধিকার থাকিত না (অনীশ্বরাঃ পিতৃমন্তঃ), এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। জীবদ্দশায় পিতা পুত্রের শিক্ষা প্রভৃতির তত্ত্বাবধান করিতেন। পুত্রের বিবাহ দেওয়াও পিতার কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত। কেন না, আমরা অর্থশাস্ত্রে দেখিতে পাই, পৈতৃক সম্পত্তি বিভাগকালে অবিবাহিত পুত্রের বৈবেশনিক এবং কুমারী কন্যার প্রদানিক পাইবার ব্যবস্থা আছে।

পুত্রদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রের সম্বন্ধে দুই একটী বিশেষ ব্যবস্থা দেখা যায়। কৌটিল্য বলেন,—

একস্ত্রীপুত্রাণাং জ্যেষ্ঠাংশঃ। ব্রাহ্মণানামজাঃ। ক্ষত্রিয়াণাম্ অশ্বাঃ। বৈশ্যানাং গাবঃ। শূদ্রাণাম্ অবয়ঃ।

কাণলিঙ্গাস্তেষাং মধ্যমাংশঃ। ভিন্নবর্ণাঃ কনিষ্ঠাংশঃ।

চতুষ্পদাভাবে রত্নবর্জ্জানাং দশানাং ভাগং দ্রব্যাণামেকং জ্যেষ্ঠো হরেৎ। প্রতিমুক্তস্বধাপাশো হি ভবতি। ইত্যৌশনসো বিভাগঃ।—পৃ ১৬২।

অর্থাৎ জ্যেষ্ঠের কিছু অতিরিক্ত অংশলাভের ব্যবস্থা ছিল। ব্রাহ্মণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতার অজ-সম্পত্তি লাভ করিতেন। ক্ষত্রিয়ের মধ্যে ঐরূপ সমস্ত অশ্ব জ্যেষ্ঠের প্রাপ্য ছিল। বৈশ্য ও শূদ্রদিগের মধ্যেও অনুরূপ ব্যবস্থা ছিল।

এগুলি ভিন্ন ঔশনস ধর্ম্মশাস্ত্রের মতে জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতৃদ্রব্যাদির দশমাংশ পাইতেন। কৌটিল্য বলেন, ঐ অতিরিক্ত সম্পত্তির দ্বারা তিনি পিতার শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিতেন। পরবর্ত্তী যুগেও এই উদ্ধার-ব্যবস্থার ভূরি ভূরি উল্লেখ দেখা যায়। মনু বলেন,—"জ্যেষ্ঠস্য বিংশ উদ্ধারঃ সর্ব্বদ্রব্যাচ্চ যদ্বরম্" কেন জ্যেষ্ঠ এই অতিরিক্ত অংশ লাভ করিতেন, তাহার বিশেষ কোন কারণ আমরা দেখিতে পাই না। মনে হয়, পিতার শ্রাদ্ধাদি কার্য্যের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত থাকিত, এবং সেইগুলি

সম্পাদনের জন্যই তাঁহাকে অতিরিক্ত সম্পত্তি দেওয়া হইত। পরবর্ত্তী যুগের ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা এই সকল কারণ নির্দ্দেশ করেন নাই। তাঁহারা কেবল জ্যেষ্ঠের উৎকর্ষেরই উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন,—"জ্যেষ্ঠস্য জাতমাত্রেণ পুত্রী ভবতি মানবঃ"; এইজন্যই জ্যেষ্ঠের প্রাধান্য। এইরূপ অন্যের মতে—"জ্যেষ্ঠপুত্রপশ্চতস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্" ইত্যাদি।

জ্যেষ্ঠ পুত্র নির্গুণ, অন্যায়বৃত্তি অবলম্বী ও মনুষ্যত্বহীন হইলে তাহার এই অংশের হ্রাস বা লোপেরও ব্যবস্থা ছিল।

বহুবিবাহস্থলে অংশের তারতম্য হইত। কোন লোক ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের কন্যা বিবাহ করিলে, উক্ত বিবাহজাত পুত্রগণের মধ্যে ভাগের তারতম্য দেখা যায়। ব্রাহ্মণীপুত্র ৪ ভাগ পাইলে ক্ষত্রিয়াপুত্র ৩ ভাগ, বৈশ্যাপুত্র ২ ভাগ ও শূদ্রাপুত্র ১ ভাগ মাত্র পাইতেন।

নারী-জীবন

অতঃপর নারীজীবনের সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ কথা বলিব। অবশ্য দাম্পত্যজীবনে স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ ও স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে। অর্থশাস্ত্রে ঐগুলি ভিন্ন আরও অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। এই অধ্যায়ে সেইগুলি আলোচিত হইবে।

সমাজ চিরদিনই পরিবর্ত্তনশীল। যুগে যুগে দেশকালপাত্রভেদে উহার পরিবর্ত্তন হয়। উহা কিছুতেই একভাবে থাকিতে পারে না। কঠোর রক্ষণশীলতাও উহাকে অপরিবর্ত্তিত রাখিতে পারে না। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এই নিয়ম। ভারতেও ঐরূপ ঘটিয়াছিল। ঘটনাস্রোতে প্রাচীন আদর্শ, প্রাচীন আচার—সবই ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকের অবস্থারও পরিবর্ত্তন হয়।

বৈদিক যুগে সমাজে স্ত্রীলোকের স্থান অতি উচ্চ ছিল। পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যসমাজগুলিতে ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য কোন দেশে স্ত্রীলোক এত উচ্চ স্থান পান নাই। তাঁহাদের স্বাধীনতা ছিল, শিক্ষার ব্যবস্থা

ছিল, উৎকর্ষের অবকাশ ছিল। তখন স্ত্রীলোক পুরুষের ক্রীড়নক বা ভোগের সামগ্রী বলিয়া বিবেচিত হয় নাই এবং তাঁহাদের সামাজিক অধিকার বিলুপ্ত হয় নাই। এ অবস্থায় স্ত্রীলোক সর্ব্ববিষয়েই সমাজের উৎকর্ষ সাধনের অধিকারে অধিকারিণী ছিলেন। সংসারে কর্ত্তৃত্বের ভার ছিল তাঁহার হাতে। যজ্ঞাদি কর্ম্মে স্ত্রী স্বামীর সাহচর্য্য করিতেন। যজমান-পত্নী ভিন্ন যজ্ঞের অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হইত না। স্ত্রীলোকের বৈদিক সংস্কার ও শিক্ষারও অধিকার ছিল।* সমাজে ব্রহ্মবাদিনী নারীর অভাব ছিল না। আজিও ঋগ্বেদে ঘোষা, সূর্য্যা, বিশ্ববারা, লোপামুদ্রা, ইন্দ্রাণী প্রভৃতি মন্ত্রদ্রষ্ট্রীদিগের দ্বারা প্রকাশিত বহু সূক্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং ঐগুলির অংশবিশেষ আজিও বিবাহাদি প্রধান সংস্কারের সময়ে সাদরে উচ্চারিত হইতেছে।

বৈদিক যুগের পরবর্ত্তী যুগেও প্রায় ঐ অবস্থা ছিল। অবশ্য এ যুগে সমাজে বহুবিবাহ, সপত্নীদ্বেষ প্রভৃতি প্রবেশ করে। স্ত্রীলোকের রাষ্ট্রীয় অধিকার ক্রমে বিলুপ্ত হইতেছিল। তাহাদের অবস্থা কিছু হীন হইয়াছিল, কিন্তু একেবারে অবনত হয় নাই। তখনও দেশে গার্গী, মৈত্রেয়ীর অভাব হয় নাই। তখনও বাল্যবিবাহের বহুল প্রচলন হয় নাই, স্ত্রীলোক জ্ঞান-চর্চ্চায় বঞ্চিত হয় নাই এবং দেশে "নিরিন্দ্রিয়া হ্যমন্ত্রাশ্চ স্ত্রিয়োঽনৃতং—" (মনু, ৯।১৮) ইত্যাদি কদর্য্য আদর্শের প্রভাব বদ্ধমূল হয় নাই।

বৌদ্ধযুগের প্রতিক্রিয়া

বৌদ্ধধর্ম্মের যুগেও এইরূপ অবস্থা দেখা যায়। দেশে ধর্ম্মের আন্দোলন চলিতেছিল। সকলেই সংসারের দুঃখবাদে পীড়িত হইল। জগৎ দুঃখের স্থানমাত্র ; জীবন ক্ষণিক—সুখদুঃখ-জ্ঞান মোহমাত্র

* যম ও হারীত পুরাকল্পে কুমারীদিগের উপনয়ন বেদাধ্যয়ন ও অগ্নি-সংস্কারের উল্লেখ করিয়াছেন।

নির্ব্বাণ বা মুক্তিই মানবের প্রধান উদ্দেশ্য—এই ভাব সকলেরই মনে বদ্ধমূল হইল। ব্রাহ্মণেতর পরিব্রাজকগণ জনসাধারণকে (mass) এই মহামন্ত্র শিখাইলেন। এই মন্ত্রের শক্তিতে সকলেই জগৎকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিল; সংসারের কর্তব্য ভুলিয়া গেল। অনেকেই গৃহ ছাড়িল। নির্ব্বাণের উদ্দেশ্যে কেহ বনে বা প্রান্তরে প্রস্থান করিল, কেহ বা সঙ্ঘে যোগদান করিল।

এই আন্দোলনে পড়িয়া স্ত্রীলোকেরাও আত্মহারা হইল। স্বাধীনতার যুগে তাহারাও পুরুষের ন্যায় নির্ব্বাণের পথে—প্রব্রজ্যার দিকে ধাবিত হইল। কতিপয় শিষ্যের, বিশেষতঃ আনন্দের অনুরোধে ভগবান্ বুদ্ধ স্ত্রীলোকের প্রব্রজ্যা গ্রহণের অনুমতি দেন। মাতা গৌতমীর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে ও প্রিয়শিষ্য আনন্দের অনুরোধে প্রোৎসাহিত হইয়া তিনি ভিক্ষুণীদিগের সঙ্ঘ গঠনের অধিকার দিলেন। ইহার বিষময় পরিণাম তাঁহার দূরদৃষ্টির অগোচর ছিল না। দলে দলে স্ত্রীলোক ভিক্ষুণীব্রত লইয়া সঙ্ঘে প্রবেশ করিতে লাগিল। কি কুমারী, কি সধবা, কি সতী, কি কুলটা সকলেই সঙ্ঘে স্থান পাইল। এই প্রসঙ্গে থেরীগাথার মুক্তা, সীহা, সুজাতা, শুভা, অনুপমা, রোহিণী, সুমেধা প্রভৃতি কুলটার নাম উল্লেখযোগ্য। অনেক রমণী যৌবনে কুলটাবৃত্তি করিয়া পরে পবিত্র ভিক্ষুণীজীবন অবলম্বন করিয়াছিলেন; ইঁহাদের মধ্যে অড্ঢকাশী, অভয়মাতা, বিমলা ও অম্বপালীর নাম করা যাইতে পারে।

স্ত্রীলোকের সঙ্ঘাধিকারের ফল বিষময় হইল। ইহাদিগের মধ্যে সংসারতাপিত মুমুক্ষুর একেবারে যে অভাব ছিল, তাহা নহে। তবে অনেক স্ত্রীপুরুষই আন্দোলন বা হুজুগে পড়িয়া সংসার ত্যাগ করিতেন। এইরূপ ক্ষণিকবৈরাগ্যে যাঁহারা সাময়িক বিতৃষ্ণার প্রভাবে সংসার ত্যাগ করিতেন, কালে আবার প্রলোভনে পড়িয়া তাঁহারা ভোগসুখাদির দিকে আকৃষ্ট হইতেন, এবং ফলে ব্যভিচারাদি ঘটিত। প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যে ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। চুল্লবগ্গের দশম অধ্যায়ে (৯-২৭) এইরূপ কতকগুলি ভিক্ষুণীর কলঙ্কের কথা বিবৃত আছে।

সঙ্ঘের মধ্যেই যে নৈতিক অবনতি ঘটিল, তাহা নহে। দুঃখবাদ-প্রচারে ও অবাধভাবে সঙ্ঘে যোগ দেওয়াতে সমাজে কর্ত্তব্যহীনতা ও ব্যভিচার আসিয়া পড়িল। অনেক পুরুষ নির্ব্বাণলাভের মোহে পড়িয়া যুবতী স্ত্রী ও পুত্রকন্যা রাখিয়া সংসার ত্যাগ করিতেন; তাঁহারা স্ত্রী ও পুত্রাদির ভরণপোষণ করার কথা মনে ভাবিতেন না। সম্বলহীন হইয়া ইহাদিগকে অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত এবং তাহার ফলে অনেকেই কুপথে ধাবিত হইত।

এই সকল কারণে সমাজে অনেক দুর্নীতি আসিয়া পড়িয়াছিল। থেরীগাথায় লিখিত ভিক্ষুণীদিগের আত্মজীবনী পাঠ করিলে আমরা এগুলির প্রভাব বুঝিতে পারি। ইহার অনেক স্থলেই স্ত্রীলোকের সংসারে অনাসক্তি, বিবাহে বিতৃষ্ণা ও গার্হস্থ্য কর্ত্তব্যে বিদ্বেষ দেখা যায়। বৌদ্ধ সাহিত্যের থেরীগাথায় কুমারী থেরীদিগের বিবরণে ক্ষেমা, কালীসুন্দরী ও প্রভবার বৃত্তান্ত হইতে কুমারীদিগের বিবাহে বিতৃষ্ণা প্রতীয়মান হয়। অনেক থেরীর কাহিনীতে স্ত্রী-জীবনের ক্লেশ, অত্যাচার-ভোগ ও সন্তান-জননে দুঃখাদির কথার উল্লেখ আছে। কৃশা গৌতমীর ন্যায় অনেকেই নারী-জীবনের ক্লেশের কথা ভাবিয়া সংসার ছাড়িতেন। থেরীগাথা পুস্তকটি প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যের অন্যতম মূল্যবান্ গ্রন্থ। উহা প্রাচীন বৌদ্ধ থেরীদিগের দ্বারা রচিত। এই গ্রন্থ সম্রাট্ অশোকের সমসাময়িক অথবা আরও কিছু প্রাচীন।

এই থেরীগাথা গ্রন্থে বহু ভিক্ষুণীর আত্মজীবনী আছে। সেগুলি এমনভাবে লিখিত, যে উহা হইতে আমরা তাঁহাদের মনোভাবের অকপট বর্ণনা পাই। এই সকল কারণে উহা ভারতীয় সামাজিক ইতিহাসের আলোচনায় আমাদের বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, থেরীগাথা-পাঠে আমরা নিম্নলিখিত দুইটি বিষয় জানিতে পারি :—

১। স্ত্রীলোকের বিবাহে বিতৃষ্ণা ও সংসারে অনাসক্তি

২। স্ত্রী পুরুষের সঙ্ঘে অবাধ-প্রবেশের ফলে সামাজিক ব্যভিচার।

প্রথমটির উদাহরণ-স্বরূপ বহু কুমারী থেরীর কথা বলিয়াছি। কাশী-সুন্দরী, ক্ষেমা ও প্রভবার বৃত্তান্তে বিবাহের আপত্তির বিষয় দেখান হইয়াছে; অন্য থেরীর দৃষ্টান্তও দেওয়া যাইতে পারে। বিবাহ করিয়া পাছে সংসারে লিপ্ত হইতে হয়, এই আশঙ্কায় তাঁহারা সকলেই কুমারী অবস্থায় সঙ্ঘে প্রবেশ করেন। দ্বিতীয়তঃ, সামাজিক ব্যভিচারের দৃষ্টান্ত স্বরূপ ঋষিদাসী নাম্নী থেরীর আত্মজীবনী উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। পিতা তাঁহার তিন ভিন্ন বার বিবাহ দিয়াছিলেন। তিন বারই যথাশক্তি স্বামিসেবা সত্ত্বেও তিনি পতি কর্তৃক পরিত্যক্তা হন। দুইটি পতি সংসার ছাড়িয়া সঙ্ঘে যোগ দিলে তিনিও মনের ধিক্কারে সংসার ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুণীব্রত গ্রহণ করেন।

ব্যভিচারের আর একটী জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত উৎপলবর্ণানাম্নী থেরীর আত্মজীবনী হইতে পাওয়া যায়। যৌবনে বিবাহের অব্যবহিত পরেই একটী মাত্র কন্যা-সন্তান জন্মিবার পর স্বামী তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুব্রত অবলম্বন করেন; তিনি কন্যাটী লইয়া গৃহে থাকেন। কন্যাটীও বয়ঃস্থা হইয়া কিশোরী অবস্থায় সঙ্ঘে প্রবেশ করে। কিছুদিন পরে সঙ্ঘের সাধ মিটিলে নিজ জন্মদাতা পিতাকে পতিরে বরণ করিয়া পিতার সহিত কন্যা স্বামী-স্ত্রী রূপে গৃহে ফিরিয়া আসে। তখন নিজ পতিকে কন্যার স্বামী হইতে দেখিয়া উৎপলবর্ণা সংসারের প্রতি ঘৃণায় ও মনের ক্ষোভে সংসার ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুণীব্রত গ্রহণ করেন।

স্ত্রীলোকের অক্ষমতার বাধা

উভো মাতা চ ধীতা চ মযং আহুং সপত্তিযো।
তস্সা মে অহু সংবেগো অব্ভুতো লোমহংসনো॥

—থেরীগাথা, ১১।৬৪॥

এইরূপ ব্যভিচার যে কত ঘটিয়াছিল, তাহা বলা যায় না। বোধ হয়, এই সকল ব্যভিচারের ফলেই সমাজে কঠোর নীতির প্রাদুর্ভাব ঘটে। ফলে কন্যার অল্পবয়সে বিবাহ দিবার প্রথা প্রচলিত হয় এবং

পিতার পক্ষে কন্যার বিবাহ দেওয়া প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হয়। ধর্ম্ম সূত্রসমূহে এইগুলির প্রভাব প্রথম দেখা যায়।

ধর্ম্মশাস্ত্রকার বশিষ্ঠ বলেন,—

পিতুঃ প্রমাদাত্তু যদীহ কন্যা
বয়ঃপ্রমাণং সমতীত্য দীয়তে।
সা হন্তি দাতারমুদীক্ষমাণা
কালাতিরিক্তা গুরুদক্ষিণেব।

প্রযচ্ছেন্নগ্নিকাং কন্যামৃতুকালভয়াৎ পিতা।
ঋতুমত্যাং হি তিষ্ঠন্ত্যাং দোষঃ পিতরমৃচ্ছতি॥

যাবন্তঃ কন্যামৃতবঃ স্পৃশন্তি
তুল্যৈঃ সকামামভিযাচ্যমানাম্।
ভ্রূণানি তাবন্তি হতানি তাভ্যাং
মাতাপিতৃভ্যামিতি ধর্ম্মবাদঃ॥

এই শ্লোকগুলিতে সামাজিক মনোভাব কতকটা পরিস্ফুট হইতেছে। তবে তখনও অতি ঘোর কঠোরতা সমাজে প্রবেশ করে নাই—তখনও অষ্টবর্ষবয়স্কা গৌরী-কন্যা দানের ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হয় নাই; বিবাহবিষয়ে কন্যা তখনও ক্রীড়নকে পরিণত হয় নাই; তখনও সমাজ কন্যার সুখকে উপেক্ষা করিয়া ধর্ম্ম রক্ষা করিতে শিখে নাই।

ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা সকলেই অষ্ট প্রকার বিবাহের উল্লেখ করিয়াছেন এবং ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্য—এই চারিপ্রকারের বিবাহকে আদরের চক্ষে দেখিয়াছেন। পৈশাচ, আসুর, রাক্ষস ও গান্ধর্ব্ব বিবাহকে তাঁহারা কিছু ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। তথাপি গান্ধর্ব্ব বিবাহ ধর্ম্মসূত্রকারদিগের চক্ষে বিশেষ অনাদরের ছিল না। কন্যা নিজের মনের মত বর বাছিয়া বিবাহ করিবে, উহাতে তখনও তাঁহাদের বিশেষ আপত্তি দাঁড়ায় নাই।

বোধায়ন স্পষ্টই বলেন,—"গান্ধর্ব্বমপ্যেকে প্রশংসন্তি সর্ব্বেষাং স্নেহানুগতত্বাৎ।"—১।১১।২০

তাঁহার বিবেচনায় পরস্পরের স্নেহসম্বন্ধের নিবন্ধ থাকায় (তত্র স্নেহো মনশ্চক্ষুষোর্নিবন্ধঃ) গান্ধর্ব্ব বিবাহ প্রশংসার্হ, টীকাকার আপস্তম্ব-বচন উদ্ধার করিয়া এ বিষয়ে তাঁহার সহানুভূতি দেখাইতেছেন। যথা,—

"যস্যাং মনশ্চক্ষুষোর্নিবন্ধস্তস্যামৃদ্ধিঃ নেতরদ্ আদ্রিয়েত।"

ধর্ম্মশাস্ত্রকার বশিষ্ঠেরও মত এইরূপ, তিনি বলেন,—

কুমার্য্যৃতুমতী ত্রীণি বর্ষাণি উপাসীত। ত্রিভ্যো বর্ষেভ্যঃ পতিং বিন্দেত্তুল্যম্॥

অর্থশাস্ত্রে কন্যার বিবাহের বয়স সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা নাই। তবে "দ্বাদশবর্ষা স্ত্রী প্রাপ্তব্যবহারা ভবতি"—এই বাক্য হইতে বুঝা যায়, সাধারণতঃ দ্বাদশ বৎসর বয়সেই কন্যাসম্প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। এই বয়সের মধ্যে বিবাহ না দিলে পিতার দণ্ডাদির ব্যবস্থা ছিল না। তবে ঋতুমতী হইলে পর কন্যা স্ব ইচ্ছায় কাহাকেও বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইলে, ঐ ব্যক্তি কন্যাদূষণের অপরাধে অপরাধী হইত না।

কৌটিল্য বলেন,—

সপ্তার্তবপ্রজাতাং পরাণাম্ ঊঢ়ন্ অনভিমানাৎ প্রকৃত্যা প্রকামী স্যাৎ। ন চ পিতৃরশক্তীং দদ্যাৎ। ঋতুপ্রতিরোধিভিঃ স্বাম্যাদপক্রামতি।

ত্রিবর্ষপ্রজাতার্তবায়াস্তুল্যো গন্তুমদোষঃ, ততঃ পরমতুল্যোঽপ্য-নলঙ্কৃতায়াঃ॥—২৩১ পৃঃ।

ইহা হইতেই তাৎকালিক সমাজবিধি বোধগম্য হয়। পরবর্ত্তী যুগে মনুও বিবাহের বয়সের দৃষ্টান্তস্বরূপ ত্রিশ বৎসরের পুরুষের সহিত দ্বাদশবর্ষী স্ত্রীর বিবাহের ব্যবস্থা দিয়াছেন ("ত্রিংশদ্বর্ষোদ্বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীম্")। আরও পরবর্ত্তী স্মৃতিকারেরা কন্যার বিবাহের বয়স আরও কমাইয়া অষ্টমবর্ষ কালকে মুখ্যকাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

কন্যার অল্পবয়সে বিবাহের ব্যবস্থা একদিনে প্রণীত বা সমাজ-কর্তৃক গৃহীত হয় নাই।

বিবাহের পর দাম্পত্যজীবনের অনেক কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। স্ত্রীর উপর স্বামীর কর্তৃত্ব বহু প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। তবে উহাতে বুঝা যায়, যে মৌর্য্য ও তৎপূর্ব্ব যুগে স্ত্রী একেবারে স্বামীর দাসীরূপে পরিণত হন নাই। স্ত্রীধন তাঁহার নিজের সম্পত্তি ছিল; সাংসারিক বিপদ্ বা অভাব ব্যতীত তাহাতে স্বামীর হস্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকার ছিল না। অর্থশাস্ত্রের বিধিগুলি দেখিলে বোধ হয়, যে স্বামীর কর্তৃত্ব অন্যান্য বিষয়ে ক্রমে দৃঢ় হইতেছিল। অপরাধে স্বামী কায়িক দণ্ডও প্রয়োগ করিতে পারিতেন, তবে অতিরিক্ত প্রয়োগে দণ্ডার্হ হইতেন। স্বামী ইচ্ছামত পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারিতেন না; তাঁহাকে কারণ দর্শাইতে হইত এবং স্ত্রীর অনুমতি গ্রহণ করিতে ও উহাকে অর্থ দিয়া তুষ্ট করিতে হইত।

স্বামী ও স্ত্রীর দাম্পত্যজীবন কলহের বা কষ্টের কারণ হইলে উহারও প্রতিকারের ব্যবস্থা ছিল। অর্থশাস্ত্রে বিবাহবিচ্ছেদের (separation বা divorce) ব্যবস্থা দেখা যায়। অর্থশাস্ত্রকারের মতে, চারিটী ধর্ম্ম্য বিবাহের (অর্থাৎ ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্য) বন্ধনমোক্ষের ব্যবস্থা ছিল না (অমোক্ষো ধর্ম্মবিবাহানাম)। অন্য বিবাহস্থলে, যেগুলি প্রধানতঃ বৈশ্য ক্ষত্রিয়াদির মধ্যে প্রচলিত ছিল, সেগুলিতে উভয়ে উভয়ের বিদ্বেষী হইলে বিবাহ বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইত—"অমোক্ষা ভর্ত্তুরকামস্য দ্বিষতী ভার্য্যা। ভার্য্যায়াশ্চ ভর্ত্তা। পরস্পরং দ্বেষান্মোক্ষঃ।"

এইরূপ মোক্ষের স্থলে যদি স্বামিপক্ষ উদ্‌যোগী হইয়া বিচ্ছেদের চেষ্টা করিতেন, তিনি গৃহীত শুল্ক প্রত্যর্পণ করিতেন, স্ত্রী মোক্ষের প্রার্থিনী হইলে শুল্ক ফিরিয়া পাইতেন না। (পুরুষবিপ্রকারাচ্চ স্ত্রী চেৎ মোক্ষমিচ্ছেৎ নাস্যৈ যথাগৃহীতং দদ্যাৎ॥—১৫৫ পৃ°।)

থেরীগাথায় ঋষিদাসীর জীবনীতে স্বামীর প্রব্রজ্যাগ্রহণের ফলে তাঁহার দুইবার বিবাহের কথা পাওয়া যায়। পুনর্ব্বিবাহিতার শুল্কসম্বন্ধীয়

ব্যবহারও কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত ইতিহাসে বিবাহচ্ছেদ ও সধবার পুনর্ব্বিবাহের আর অধিক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

পরবর্ত্তী যুগের ধর্ম্মশাস্ত্রে স্ত্রীলোকের পুনর্ব্বিবাহের কথার উল্লেখ আছে। তবে বিবাহবিচ্ছেদাদির কথা নাই। মনুস্মৃতি বা বশিষ্ঠস্মৃতিতে বালবিধবার পুনর্ব্বিবাহের কথা আছে। প্রকৃতপক্ষে বিধবার পুনর্ব্বিবাহের পূর্ণ নিষেধ-বিধি কোন স্মৃতিতেই নাই; নিন্দা মাত্র আছে। যথা,—

বশিষ্ঠ বলেন,—

> পাণিগ্রাহে মৃতে বালা কেবলং মন্ত্রসংস্কৃতা।
> সা চেদক্ষতযোনিঃ স্যাৎ পুনঃসংস্কারমর্হতি॥ ১৭।৭৪।

মনুও ঐরূপ বালবিধবার পুনঃসংস্কারের কথা বলিয়াছেন। পরাশরাদি অন্য সকল ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরও ঐ মত; যথা—

> নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
> পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥

এইরূপ পুনঃসংস্কারের সম্পূর্ণ নিষেধবিধি কোন ধর্ম্মশাস্ত্রে নাই; তবে পরবর্ত্তী যুগের পুরাণাদির মধ্যে নিষেধবিধি পাওয়া যায়। সমাজেও উক্ত মত গৃহীত হয় এবং সমাজ বিধবার পুনর্ব্বিবাহের বিরোধী হইয়া উঠে। বর্ত্তমানের সামাজিক আচার ও আদর্শ স্ত্রীলোকের পুনর্ব্বিবাহের বিরোধী। নারীর পুনর্ব্বিবাহাদির ফলে সামাজিক ব্যভিচার ও পারিবারিক কলহ ঘটিবার ভয়েই সমাজে ঐরূপ মত একরূপ বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় প্রবর্ত্তিত রাজবিধিও উহার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে নাই।

চতুর্থ অধ্যায়

অর্থশাস্ত্রে ধর্ম্ম এবং সংস্কার

সমাজ ও সামাজিক জীবন ব্যতীত কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র হইতে আমরা লৌকিক ধর্ম্ম, ক্রিয়াকলাপ ও সংস্কার প্রভৃতির বিবরণ পাই। যদিও উহা খুব অল্প, তাহা হইলেও ভারতবর্ষের উত্তরাংশের তাৎকালিক সমাজের ধর্ম্মজীবন এবং লোকসাধারণের মানসিক অবস্থার পরিচায়ক বলিয়া উহার মূল্য কম বলা যায় না।

অর্থশাস্ত্র ধর্ম্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মবিদ্যার গ্রন্থ নহে। উহাতে কৌটিল্য ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গের আপেক্ষিক মর্য্যাদা প্রভৃতি লইয়া বিশেষ কোন বাদানুবাদ করেন নাই। তাহা হইলেও অর্থশাস্ত্রে আমাদের জ্ঞাতব্য অনেক কথা পাওয়া যায়। বিদ্যা-সমুদ্দেশ অধ্যায়ে আমরা জ্ঞানের ভিত্তিমূলক শাস্ত্রসমুদায়ের উদাহরণ পাই। এই সম্পর্কে কৌটিল্য আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্ত্তা, দণ্ডনীতি প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। আবার, আন্বীক্ষিকী বা তর্কশাস্ত্রের (চিন্তামূলক দর্শনের) উদাহরণস্বরূপ তিনি সাংখ্য, যোগ এবং লোকায়তের কথা বলিয়াছেন (সাংখ্যং যোগো লোকায়তং চেত্যান্বীক্ষিকী।—অ° শা°, পৃ° ৬)। এগুলি দেখিয়া কৌটিল্য-সম্বন্ধে একথা অবিসংবাদিতরূপে বলা যাইতে পারে, যে রাজনৈতিক লেখকদিগের মধ্যে কেবল তিনিই পর-বিজ্ঞানকে (Metaphysice) উহার উপযুক্ত স্থান দিয়াছেন এবং উহাকে সর্ব্ব বিজ্ঞানের ভিত্তি বলিয়া মানিয়াছেন।* অর্থশাস্ত্রে আন্বীক্ষিকীর বিবরণ আমরা পাই না বলিলেই হয়; বর্ত্তমান পুস্তিকাতেও তৎসম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা

* প্রদীপঃ সর্ব্ববিদ্যানামুপায়ঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
আশ্রয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং শশ্বদান্বীক্ষিকী মতা।

আমাদের উদ্দেশ্য নহে। কৌটিল্যের গ্রন্থে সাংখ্য এবং যোগ সম্বন্ধে বিশদভাবে কিছু পাওয়া যায় না; লোকায়তের সম্বন্ধেও আমরা কিছু জানি না বলিলেই হয়। লোকায়তিকেরা অবশ্য ধর্মশাস্ত্র ও দর্শনাদিতে নাস্তিক, পার্থিবসুখপ্রয়াসী ও বেদবিরোধী জড়বাদী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন।

লোকায়ত-দর্শনের সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা অর্থশাস্ত্রে নাই তবে কামসূত্র এবং সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থে আমরা যাহা পাই, তাহাতে বোধ হয়, লোকায়তিকেরা পরলোক, পুনর্জন্ম ও আত্মার অবিশ্বাসী ছিলেন। পার্থিব ইন্দ্রিয়সুখ জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, ইহাই তাঁহারা প্রচার করিতেন।

অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত বেদের বিরুদ্ধবাদীদিগের এবং ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের শত্রুদের মধ্যে বৌদ্ধেরা এবং আজীবকেরা প্রধান। সিদ্ধতাপস ভিন্ন কৌটিল্য ইহাদের আর সকল সম্প্রদায়ের উপরই বিদ্বেষভাবসম্পন্ন। সিদ্ধতাপসদের কথা আমরা পরে বিশেষরূপে বলিব। এই সকল সম্প্রদায়ের প্রতি কৌটিল্যের বিদ্বেষভাব তৎকালীন লৌকিক বিরাগের পরিচায়ক। ইহার বিবরণ অপরাপর অনেক পুরাতন গ্রন্থে পাওয়া যায়।

প্রকীর্ণক নামক অধ্যায়ের কোনও বিশেষ স্থলে বৌদ্ধ এবং আজীবক-দিগের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। তথায় আমরা দেখি, যজ্ঞ উপলক্ষে অথবা পিতৃপুরুষদিগকে পিণ্ডাদি প্রদান করিবার সময় যদি কেহ শাক্য বা আজীবকদিগের ন্যায় "বৃষল প্রব্রজিত"দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন, তবে তাঁহার ১০০ পণ অর্থদণ্ড হইত ("শাক্যাজীবকাদীন্ বৃষল-প্রব্রজিতান্ দেবপিতৃকার্য্যেষু ভোজয়তঃ শত্যো দণ্ডঃ।"—পৃ° ১৯৯)। এই বিধান এবং পাষণ্ডদিগের প্রতি প্রযুক্ত অপরাপর নিয়মাবলী হইতে এই সকল দলের উপর শাসনকর্ত্তৃবর্গের মনের ভাব প্রতীয়মান হয়। তাহাদিগকে গ্রামে থাকিতে কিংবা সঙ্ঘবদ্ধ হইতে দেওয়া হইত না। শ্মশানের নিকট তাহাদিগের আবাস থাকিত (পাষণ্ডচণ্ডালানাং শ্মশানান্তে বাসঃ)।

"বানপ্রস্থাদন্যঃ প্রব্রজিতভাবঃ সজাতাদন্যঃ সঙ্ঘঃ সামুত্থায়িকাদন্যঃ সময়ানুবন্ধো বা নাস্য জনপদমুপনিবেশেত।" —পৃ ৪৮। ইহা হইতে দেখা যায়, কর্তৃপক্ষ তাহাদিগকে দমন করিবার চেষ্টা করিতেন।

যদিও প্রধান দার্শনিক সম্প্রদায়গুলির কথা অতি অল্প, তথাপি অর্থশাস্ত্রের বিবরণ লৌকিক ধর্ম্মের উপর আলোকরশ্মি নিক্ষেপ করে এবং উহা সামাজিক বিজ্ঞান, ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মতত্ত্বের ক্রমবিকাশের তুলনা করে বাস্তবিকই বিশেষ প্রয়োজনীয়। আমরা যে ইহাতে কেবলমাত্র বহুসংখ্যক দেবদেবী, রাক্ষস এবং প্রেতাত্মার পূজাকলাপ দেখিতে পাই, তাহা নহে, অদ্ভুত ক্রিয়াদি এবং প্রাচীন যুগের সংস্কার প্রভৃতিও আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। আজ পর্য্যন্তও উহাদের অনেকগুলি প্রচলিত আছে। কৌটিল্যের সময়ের দেবদেবীর মধ্যে কতকগুলির পূজা বৈদিক যুগে এবং অপরগুলি নিঃসন্দেহ তৎপরবর্ত্তী যুগে প্রচলিত হইয়াছিল। পূজ্যশ্রেণীর ভিতর ইন্দ্র, যম, বরুণ, সবিতা, অগ্নি, সোম, অদিতি, অনুমতি, সরস্বতী ইত্যাদির নাম অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। স্বর্গের দেবতাদিগের মধ্যে কেবল ইন্দ্রই তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব সংরক্ষণ করিয়াছিলেন। অনাবৃষ্টির সময়ে ইন্দ্রকে শচীনাথরূপে বৃষ্টিদানের নিমিত্ত আহ্বান করা হইত (পৃ° ২০৮)। ঐন্দ্রাবার্হস্পত্য নামক ক্রিয়াতে এবং বন্ধ্যানারীকে পুত্রদান ও গর্ভস্থিত শিশুর শুভবৃদ্ধির জন্য ইন্দ্রের পূজা করা হইত। পরলোকগত মৃত ব্যক্তিদিগের নিয়ামক বা দণ্ডদানের কর্ত্তা হিসাবে যম তাঁহার পূর্ব্বপদ বজায় রাখিয়াছিলেন। বরুণও মন্দকর্ম্ম বা কুকার্য্য করণেচ্ছুর দমনকারী বলিয়া পূর্ব্বের ন্যায় পূজিত হইতেন।

এ সকল ছাড়া আমরা পরবর্ত্তী যুগের কতকগুলি দেবতা সম্বন্ধে কিছু কিছু আভাস পাই। কোনও নূতন নগর বা দুর্গ নির্ম্মিত হওয়ার সময়, কতকগুলি অবশ্যকরণীয় ক্রিয়া-কলাপের সম্পর্কে কয়েকজন দেবতার উল্লেখ দেখা যায়। তাঁহাদের পূজায় নূতন নগরবাসীদিগের শান্তি এবং সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইত বলিয়া কৌটিল্য মনে করিতেন। সেই সকল দেবতার নাম—অপরাজিত, অপ্রতিহত, জয়ন্ত, বৈজয়ন্ত,

শিব, বৈশ্রবণ, অশ্বি, শ্রী এবং মদিরা ("অপরাজিতাপ্রতিহত-জয়ন্ত-বৈজয়ন্তকোষ্ঠকান্ শিববৈশ্রবণাশ্বিশ্রীমদিরাগৃহং চ পুরমধ্যে কারয়েৎ।"—পৃ ৫৫-৫৬)। এই সকল দেবতার সম্মানের জন্য নগর বা দুর্গ মধ্যে মন্দির নির্ম্মাণ করা হইত। উল্লিখিত দেবতাদের মধ্যে প্রথম চারিটির নাম জৈন-গ্রন্থ "উত্তরাধ্যয়নসূত্রে" পাওয়া যায়, কিন্তু সেস্থলে এই সমুদায় দেবতার পূজার বা উহার সার্থকতার কথা কিছু উল্লিখিত হয় নাই। দেবতাদিগের নামগুলির অর্থ কিন্তু খুব স্পষ্ট। অপরাজিত এবং অপ্রতিহত অর্থে 'শত্রুদিগের দ্বারা অবিজিত'কে বুঝায়; জয়ন্ত এবং বৈজয়ন্ত শব্দে 'রণে বিজয়ী' অর্থাৎ বিজয়দাতা বুঝায়। ইহাদিগকে আমরা যুদ্ধের অধিষ্ঠাতা দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। ইহাদিগের সঙ্গে আশীর্ব্বাদ বা মঙ্গল-দাতা শিবের পূজার উল্লেখ দেখা যায়। বর্ত্তমান ভারতবর্ষেও শৈবদিগের সংখ্যা অত্যধিক। বৈশ্রবণ বা কুবের ধনাধিপতি; ইহার পূজা উপাসকদিগের ধনসম্পদ্ আনয়ন করিত। অশ্বিদ্বয় ছিলেন দেবচিকিৎসক; ইহাদিগকে চিকিৎসা-পারদর্শী বলিয়া জনসাধারণ ভক্তি করিত। শ্রী বা লক্ষ্মী প্রাচুর্য্য এবং সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী ছিলেন; ইনি বৈদিক যুগের শেষাংশ হইতে পূজা পাইয়া আসিতেছেন। শতপথব্রাহ্মণে ইনি প্রথম উল্লিখিত হন (শতপথ ব্রা—পৃ ১১, বি ৪; Buddhist India, পৃ° ২১৭-২০)। পরবর্ত্তী সাহিত্যে ইহার বিশেষ উল্লেখ আছে। অবশেষে মদিরার কথা বলা হইয়াছে। মদিরার বিষয়ে আমরা পূর্ব্ববর্ণনা হইতে এই জানিতে পারি, যে ইহার স্থান নগরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ছিল। পরবর্ত্তিকালে এই দেবী মহাদেবী দুর্গা বলিয়া কথিতা হন। উক্ত যুগে সম্ভবতঃ ইনি উৎসবের অধিষ্ঠাত্রী ছিলেন; এই জন্যই তাঁহার নাম মদিরা (wine) দেওয়া হইয়াছিল। এই সময়ে মদিরার প্রচলন খুব বেশী ছিল।

ইহার পর চারি দিকের চারিটি অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উল্লেখ পাই (যথাদিশং চ দিগ্দেবতাঃ)। উপযুক্ত স্থানেই ইহাদের মন্দিরাদি ছিল। নগরের চারিটি দ্বার চারিজন দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হইত। উক্ত

দেবতাদের নাম ব্রহ্মা, ইন্দ্র, যম ও সেনাপতি (ব্রাহ্মেন্দ্রযাম্যসৈনাপত্যানি দ্বারাণি—পৃ° ৫৬)। দুর্গমধ্যে কুমারী দেবীর পূজার জন্য একটি মন্দির নির্ম্মিত হইত।

এতদ্ভিন্ন প্রায় সকল নগরীতেই কোনও না কোন অধিষ্ঠাত্রী দেবতার কিংবা নগররাজ-দেবতার উদ্দেশে মন্দির উৎসর্গ করা হইত (ততঃ পরং নগররাজদেবতাঃ)।

গ্রামে গ্রামবাসীদিগের নিজের দেবতা থাকিত। অর্থশাস্ত্রের একাধিক স্থলে আমরা তাহার উল্লেখ পাই। আমরা দেখি, গ্রাম্য দেবতার সম্পত্তি গ্রামের মাতব্বর লোকদিগের দ্বারা পরিচালিত হইত। অপর এক স্থলে কৌটিল্য স্থানীয় দেবতাদিগের নামে বৃষোৎসর্গের কথা উল্লেখ করিয়াছেন (গ্রামদেববৃষাঃ)। উহারা অবধ্য ছিল।

পারিবারিক দেবতার কথাও আমরা পাই। তাঁহারা গৃহস্থালী বা ক্ষেত্রের অধিষ্ঠাতা ছিলেন।

যে সকল দেবতার কথা বলা হইল, ইঁহাদের প্রত্যেকের পূজার জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থান, এবং ইঁহাদিগের মন্দিরাদির পরিচালনের নিমিত্ত ক্ষেত্রাদি সংলগ্ন ছিল। অর্থশাস্ত্রের সময়ে এ সমুদায় বিষয়ের তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত দেবতাধ্যক্ষ নামক একজন পৃথক্ রাজপুরুষ নিযুক্ত ছিলেন।

সে সময়ে প্রতিমার প্রচলন ছিল বলিয়া মনে হয়, তবে সে সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই পাই না। অন্ততঃ দুই স্থলে দেবতাদিগের প্রতিমার উল্লেখ দেখা যায় (দৈবতপ্রতিমানাং চ গমনে দ্বিগুণঃ স্মৃতঃ পৃ° ২৩৪, পং ১৫ ; দেবধ্বজপ্রতিমাভির্বা পৃ° ৪০০, পং ১৯)।

অন্যান্য উপাস্য দেবতাদিগের মধ্যে নদী, পর্ব্বত এবং পবিত্র বৃক্ষাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার কথা পাওয়া যায়। উপনিপাত-প্রতীকার অধ্যায়ে এক স্থানে আমরা বন্যা নিবারণার্থ পর্ব্বদিনে নদীপূজার কথা পাই (পর্ব্বসু চ নদীপূজাঃ কারয়েৎ)। গঙ্গাপূজার কথা বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে। এই অধ্যায়ের মধ্যেই পর্ব্বতপূজার কথা পুনঃপুনঃ বলা হইয়াছে (পর্ব্বসু চ পর্ব্বতপূজাঃ কারয়েৎ —পৃ° ২০৮ ও ২০৯)।

এই সমস্ত দেবতার পূজার পরে আমরা বিপদ্ দূরীকরণার্থ দানব, উপদেবতা, এমন কি, প্রাণিবিশেষের পূজার কথা উল্লেখ করিতে বাধ্য। কৌটিল্যের সময়ে দানবপূজা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। ঔপনিষদিক পরিচ্ছেদে অসুরদিগের মধ্যে আমরা বলি, বৈরোচন, শম্বর, ভণ্ডীরপাক, নরক, নিকুম্ভ এবং অন্যান্য অনেকের নাম উল্লিখিত দেখিতে পাই (পৃ° ৪১৭-১৯)। সাধারণতঃ অমাবস্যার দিনে ঘোটক ও হস্তিসমূহ হইতে ভূত দূরীকরণার্থ উপদেবতার পূজা সম্পন্ন হইত (কৃষ্ণসন্ধিসু ভূতেজ্যাঃ। পৃ ১৮৫, পং ৯ ; পৃ° ১৭৯, পং ৬)।

প্রাণিপূজার মধ্যে সর্প, ইন্দুর, কুম্ভীর এবং ব্যাঘ্র পূজার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এ সমস্ত পূজা পূর্ণিমা বা অমাবস্যার দিনে সম্পন্ন হইত। ইহার মধ্যে সর্পপূজার কথাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নানা স্থানে ইহার কথা বলা হইয়াছে ঃ কোশাভিসংহরণ অধ্যায়ে ধনশূন্য রাজভাণ্ডার পরিপূর্ণ করার কৌশল বর্ণনার মধ্যে আমরা দেখিতে পাই, জীবন্ত সর্পকে শূন্যগর্ভ সর্পপ্রতিমূর্ত্তির মধ্যে রাখিয়া দেওয়া হইত। তাহাতে সর্পদেবতার উদ্দেশে কিছু দেওয়ার জন্য জনসাধারণকে প্রবর্ত্তিত করা হইত (পৃ° ২০৩)।

এতদ্ভিন্ন পবিত্র বৃক্ষ ও চৈত্যকে লোকে সম্মান প্রদান করিত। মাটির স্তূপ প্রভৃতিকেই সম্ভবতঃ চৈত্য বলা হইত। কতকগুলি চৈত্য বৃক্ষাদি এবং ধর্ম্মমন্দির প্রভৃতির সহিত সংলগ্ন থাকিত। বোধ হয়, ঐগুলি প্রাচীনতর আচার ও বিশ্বাসের অঙ্গীভূত ছিল। চৈত্যগুলি রাক্ষস ও প্রেতাত্মাদিগের আবাসস্থল বলিয়া পরিগণিত ছিল। ঔপনিপাত-প্রতীকার নামক অধ্যায়ে আমরা দেখি, পর্ব্বদিনের সময়ে দানবভয় নিরাকরণার্থ ঐ সমুদায় চৈত্যের পূজা করা হইত। এ সম্বন্ধে আমরা আর যে সকল বিবরণ পাই, তাহাতে জানা যায়, যে চৈত্যস্থিত আত্মাদিগকে পতাকা, ছত্র এবং অপরাপর জিনিষ দিয়া সন্তুষ্ট করা হইত। ছাগবলির কথাও পাওয়া যায় (পর্বসু চ বিতর্দিচ্ছত্রোল্লোপিকা-হস্তপতাকাচ্ছাগোপহারৈঃ চৈত্যপূজাঃ কারয়েৎ—পৃ° ২১০)। রাজসরকার

হইতে চৈত্যগুলিকে রক্ষা করা হইত এবং কেহ যদি ইহার অনিষ্ট করিত, তাহা হইলে তাহাকে দণ্ড দেওয়া হইত (পৃ° ১২৭); যথা

সীমবৃক্ষেষু চৈত্যেষু দ্রুমেষ্বালক্ষিতেষু চ।
ত এব দ্বিগুণা দণ্ডাঃ কার্য্যা রাজবনেষু চ॥

লোকের মনের উপর দানব, অপদেবতা বা অন্য প্রকারের দুষ্টাত্মার খুব আধিপত্য ছিল। দানবদিগের কথা অনেক জায়গায় আছে। উপনিপাত-প্রতীকার অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, যে অথর্ব্ববেদের পুরোহিত-দিগকে তাহাদিগের দূরীকরণার্থ নিযুক্ত করা হইত। বলিতে কি, শাসন-কর্তৃগণ প্রজাদিগের নিকট হইতে অর্থ আদায়ের জন্য এই দানবভয় ও তজ্জনিত আশঙ্কার সুযোগ লইতেন।

লোকের মানসিক ভাব এইরূপ থাকাতে দৈবশক্তি, ভোজবাজী ও মন্ত্রতন্ত্রে বিশ্বাসের অবধি ছিল না।

লোকের অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হওয়ার কথা অনেক স্থলে সুপরিব্যক্ত আছে। সিদ্ধতাপস, জটিল ও মুণ্ড সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, যে তাঁহারা বিনা আহারে অনেক দিন থাকিতে পারেন; তাঁহারা তাঁহাদের উপাসক-দিগের জন্য সম্পদ আনিতে পারেন; সাধারণের ও নিজের মন্দ দূর করিতে পারেন এবং ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে, তাহা বলিয়া দিতে পারেন। ইহাদের মধ্যে অনেকে বলিতেন, যে তাঁহারা এমন মন্ত্র-তন্ত্র জানেন, যাহা দ্বারা রুদ্ধ দরজা তৎক্ষণাৎ খুলিয়া যায়, স্ত্রীলোকের মনে ভালবাসার সঞ্চার হয়, এবং নূতন ক্ষত আরোগ্য হয়। বলা বাহুল্য, এই সকল লোকের মধ্য হইতেই অপরাধীদের অনুসন্ধানের জন্য বহুসংখ্যক রাজকীয় গুপ্তচর নিযুক্ত করা হইত।

মন্ত্রতন্ত্রাদিতে লোকের বিশ্বাস খুব প্রবল ছিল। দেবতার কোপই মহামারী, দুর্ভিক্ষ এবং সংক্রামক ব্যাধির হেতু বলিয়া লোকের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। রাজসরকারে সিদ্ধতাপস এবং অথর্ব্ববেদজ্ঞ লোকদিগকে আপদ্ নিরাকরণের জন্য নিযুক্ত করিতেন। কৌটিল্য নিজেও তন্ত্রমন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন।

এই সকল ক্রিয়ার মধ্যে আমরা বৃষ্টির জন্য তন্ত্রমন্ত্র (পৃ° ২০৮— 'মহাকচ্ছবর্দ্ধন' ক্রিয়া [নদীর তীরে বৃষ্টির জন্য ?] —"বর্ষাবগ্রহে শচীনাথ-গঙ্গাপর্ব্বতমহাকচ্ছপূজাঃ কারয়েৎ"), এবং মহামারীর কবল হইতে লোকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য সিদ্ধ ও তাপসেরা যে কঠোর উপজপ এবং প্রায়শ্চিত্ত করিতেন, তাহার উল্লেখ পাই (ঔষধৈশ্চিকিৎসকাঃ, শান্তিপ্রায়শ্চিত্তৈর্ব্বা সিদ্ধতাপসাঃ)। অগ্নির আক্রমণ হইতে গ্রাম রক্ষা করিবার জন্য পর্ব্বদিনে অগ্নিপূজা করা হইত (বলিহোমস্বস্তিবাচনৈঃ পর্ব্বসু চাগ্নিপূজা কারয়েৎ)। মহামারী হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে ক্রিয়াগুলি করা হইত, তাহাতে অনেক নূতনত্ব আছে। এই উপলক্ষে কেবলমাত্র যে দেবতাদিগকে আহুতি প্রদান এবং 'মহাকচ্ছ-বর্দ্ধন' ক্রিয়া সম্পাদন করা হইত, তাহা নহে। শ্মশানে গোদোহন, মৃতদেহ (কবন্ধ) দহন এবং রাত্রিতে দেবতাদের উদ্দেশে মন্ত্র উচ্চারণ করা হইত (তীর্থাভিষেচনং মহাকচ্ছবর্দ্ধনং গবাং শ্মশানাবদোহনং কবন্ধদহনং দেবরাত্রিং চ কারয়েৎ।—পৃ° ২০৮)।

কোন কোন সাধনের জন্য লোকে আরও অদ্ভুত অদ্ভুত ক্রিয়া করাইত, যেমন অর্থ ও সম্পদ প্রাপ্তি, পুত্রজনন এবং স্ত্রীলোকের ভালবাসা প্রাপ্তির জন্য ক্রিয়াদি। অর্থশাস্ত্রের শেষ অধিকরণ হইতে আমরা এই সমস্ত গুপ্ত বিদ্যা বা কৌশলাদির কথা জানিতে পারি তাহাতে যে কেবলমাত্র শত্রুর অনিষ্ট সাধন করিবার জন্য ঔষধ ও বিষের কথা পাই, তাহা নহে; ইহাতে শত্রুকে অন্ধ, মূক, বধির, ক্ষয়রোগগ্রস্ত এবং কুষ্ঠাক্রান্ত করিবার জন্য অনেক ঔষধ বা ক্রিয়ার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এ সকল ছাড়া, ইহাতে এমন কতকগুলি বিধিনিয়মের উল্লেখ আছে, যাহা পালন করিলে লোকে মাসাবধি উপবাস করিতে, অনেকদূর ভ্রমণ করিতে, অদৃশ্য হইতে, অথবা অগ্নি ও ক্লান্তি হইতে নিরাপদ্ হইতে পারে। এ সমস্ত ব্যাপারের অধিকাংশই সিদ্ধ ও তাপসগণের দ্বারা সাধিত হইত। তাঁহারা লোকের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন; এমন কি, স্বয়ং রাজা তাঁহাদের ভরণপোষণ করিতেন।

এই ক্রিয়াগুলির অধিকাংশই চৈত্যে কিংবা শ্মশানে অনুষ্ঠিত হইত। একটু বিশদভাবে আলোচনা করিলে আমরা আরও দেখি, যে এ সমস্ত গোপনীয় ব্যাপার এবং উহাদের আশ্চর্য্যজনক ফলের উপর লোকের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। মৃতমনুষ্যশরীরের বিভিন্ন অংশে কিংবা অস্বাভাবিক-মৃত্যুকবলিত নীচজাতীয় লোকের মস্তকের খুলিতে বিভিন্ন অদৃশ্য দৈবশক্তির আরোপ করা হইত। শ্মশানে দেবোদ্দেশে মদ্যদান ও প্রাণিবধ প্রভৃতি বিশেষ ফলদায়ক বলিয়া লোকের ধারণা ছিল। এই সমস্ত ক্রিয়াতে তন্ত্রের কিছু কিছু আধিপত্যের আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু এগুলি অথর্ব্ব পুরোহিতগণ দ্বারা পরবর্ত্তিকালে উদ্ভাবিত অথবা প্রাচীন আচারের অনুকরণ মাত্র, বর্ত্তমানে আমরা সে বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত করিতে পারি না। যাহা হউক, এ সমস্ত হইতে ইহাই প্রমাণিত হয়, যে পরবর্ত্তিকালে তন্ত্রে পরিণত একটি ধর্ম্মমতের ও আচারের তখন ক্রমবিকাশ হইতেছিল।

এই সময়ে আবার স্বপণ, অভিষেক, রাজসূয়, ক্রতু প্রভৃতি অনেকগুলি বৈদিক যজ্ঞের প্রচলন ছিল। এই সমস্ত কার্য্যে নিয়োজিত পুরোহিতগণের প্রাপ্যের নিয়মাবলী হইতে ইহা প্রমাণিত হয়। বৈদিক ধর্ম্মানুযায়ী এবং লোকের বিশ্বাসানুযায়ী কতকগুলি দিন বিশেষ পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইত। পর্ব্বদিন ব্যতীত আরও পবিত্র তিথির উল্লেখ আছে। এই সকল দিন বিশ্রাম দিবস বলিয়া পরিগণিত হইত। এমন কি, এই সকল দিনে শ্রমিকেরাও অতিরিক্ত বেতন ব্যতীত কাজকর্ম্ম করিত না (পৃঃ ১১৪)।

উৎসবাদির বিশেষ প্রচলন ছিল। আমোদপ্রমোদের জন্য সম্মিলন ত ছিলই, তাহা ছাড়া ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য সম্মিলন খুবই প্রচলিত ছিল। তন্মধ্যে পঞ্চরাত্র, দেবরাত্রি উৎসব, যাত্রা ও সমাজের উল্লেখ আছে; জনসাধারণ এই সব সম্মিলনীতে যোগদান করিয়া আনন্দোৎসবে ও উপাসনায় সময় যাপন করিত। মদ্যপান এই সকল উৎসবের একটি অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইত এবং চারিদিনের জন্য মদ্য প্রস্তুত করিবার

কোন অনুমতি বা লাইসেন্স লাগিত না। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে উপাসনার জন্য বিশেষ বিশেষ সম্মিলনের কথারও উল্লেখ আছে (দেবরাত্রি—পৃ° ২০৮)।

মানবজীবনে নক্ষত্রগণের প্রভাব সম্বন্ধে লোকের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। সীতাধ্যক্ষ পরিচ্ছেদে লিখিত আছে, যে শস্য উৎপাদনে বৃহস্পতি ও শুক্রের প্রভাব আছে। জন্মনক্ষত্র ও জন্মতিথিতে নরপতিগণ পূজাদির অনুষ্ঠান করিতেন এবং উক্ত দিনে তাঁহারা কয়েদীদিগকে কারামুক্ত করিয়া দিতেন (বন্ধনাগারে চ বালবৃদ্ধব্যাধিতানাথানাং চ জাতনক্ষত্র-পৌর্ণমাসীষু বিসর্গঃ—পৃ° ১৪৯)। কৌটিল্য গ্রহ-নক্ষত্রের একপ শক্তিতে বিশ্বাস করিতেন না; কিন্তু দুষ্ট গ্রহ-নক্ষত্রগণের পক্ষে মানুষের সুখসম্পদ্ নষ্ট করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়া তিনি স্বীকার করিতেন। অবশ্য গ্রহনক্ষত্রে অতি বিশ্বাসবান্ লোককে তিনি নিজেই নিম্নলিখিতভাবে উপহাস করিতেছেন:—

নক্ষত্রমতিপৃচ্ছন্তং বালমর্থোঽতিবর্ত্ততে।
অর্থো হ্যর্থস্য নক্ষত্রং কিং করিষ্যন্তি তারকাঃ॥

—পৃ° ৩৫১।

জনসাধারণ কিন্তু এগুলিতে বিশ্বাস করিত। করকোষ্ঠী, হস্তগণনা, শরীরের শুভাশুভ লক্ষণ নিরীক্ষণ (অঙ্গবিদ্যা), অন্তরচক্র ইত্যাদি-দ্বারা অনেক লোক জীবিকানির্ব্বাহ করিত। রাজা ও ধনীরা জ্যোতির্ব্বিদ্, মৌহূর্ত্তিক, ভবিষ্যদ্বক্তা কার্তান্তিক, নৈমিত্তিক ও কার্য্যলক্ষণবিদগণের পরামর্শ লইতেন (পৃ° ২০৮)। জম্ভকবিদ্যা, প্রচ্ছন্নবিদ্যা, মায়াগত ইত্যাদিতে লোকের আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। জনসাধারণ এ সমস্ত বিদ্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের পরামর্শ গ্রহণ করিত এবং তাঁহাদিগকে নানা কার্য্যে নিযুক্ত করিত। পালি "ব্রহ্মজালসূত্রে" এগুলির নিন্দা করা হইয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়

অর্থশাস্ত্রে সমাজতত্ত্ব

সামাজিক জীবনের প্রকৃতি

অর্থশাস্ত্র-যুগের সামাজিক জীবনের অনেক বৈশিষ্ট্য ছিল। মনে হয়, যেন সে সময়ে জীবন-সংগ্রাম এখনকার দিনের মত এত কঠোর ছিল না। আমাদের সময়ের মত লোকে আমরণ উদরান্নের চিন্তায় কাটাইত না। যাহার যেমন অবস্থা, সে সেরূপই নিজ সঙ্গতির মধ্যে থাকিয়া অতিচিন্তা বা অতিক্লেশের দাস না হইয়া স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করিত। কৃষকাদি নিজ নিজ শস্যসম্পদেই জীবননির্ব্বাহের ক্লেশের হাত হইতে অব্যাহতি পাইত। শ্রমজীবীরাও অভাব-পীড়িত ছিল না। ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি উচ্চবর্ণের লোকেরা উচ্চ রাজকার্য্যে অর্থ উপার্জ্জন করিত। আর বৈশ্য শেঠ বা ধনীদিগের ত কথাই ছিল না।

নানা কারণে তখন জীবন-সংগ্রাম এত কঠোর হয় নাই। লোকে নিজ নিজ বৃত্তি অবলম্বন করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিত। আজকালের মত এত উচ্চ আশা ছিল না। এখনকার মত বিদেশীয় কুশিক্ষার মোহে নিজ নিজ জীবিকার পথ ছাড়িয়া, চাকুরী বা উচ্চ পদের আশায় সেকালের লোক নিজ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পথে কাটা দিত না। বৈদেশিক ব্যবসাবাণিজ্যও এত প্রবল হয় নাই, আর ব্যবসার নামে দেশের শস্য বা উৎপন্ন দ্রব্যের রপ্তানির এত ব্যবস্থা ছিল না। দেশের টাকা দেশেই থাকিত। রাজকর্ম্মচারীরা জিনিসের দর বাঁধিয়া দিতেন, তাঁহারা ব্যবসায়ীদিগকে অবাধ স্বাধীনতা দিতেন না, তাহারা ইচ্ছামত দ্রব্যাদির দর বাড়াইতে পারিত না। রাজসরকার প্রজাসাধারণের স্বাচ্ছন্দ্য আগে দেখিতেন

লোকে ভোগসুখ করিতেও জানিত। এখনকার মত দারিদ্র্য-পীড়নের ফলে নিরানন্দের স্রোত তখন দেশে আসে নাই। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের এককালীন সেবা চলিত। ধর্ম্মের নামে এত কাঠোর্য্য ছিল না, বরঞ্চ অর্থৈষণা দেশে প্রবল ছিল। প্রথম জীবনে বিদ্যাচর্চ্চা, দ্বিতীয়ে ধনাগম গার্হস্থ্যজীবন, আর শেষ বয়সে ধর্ম্মচর্চ্চার ব্যবস্থা ছিল। মুমুক্ষু বা জ্ঞানলিপ্সায় লোকে ধর্ম্মস্পৃহার জন্য সঙ্ঘাদিতে যোগ দিতেন, আর আর্য্যমতাবলম্বীর দল শেষ বয়সে বানপ্রস্থী বা ভিক্ষু হইতেন।

কিন্তু ধর্ম্ম লইয়া বাড়াবাড়ি করার সুবিধা ছিল না। মধ্য বয়সে কেহ স্ত্রীপুত্রাদির ভরণপোষণের ব্যবস্থা না করিয়া সন্ন্যাসী হইলে তাঁহাকে রাজকোপে পড়িতে হইত, আর স্ত্রীলোককে সঙ্ঘে যোগদান করাইলে বিশেষ দণ্ড হইত। কেহ সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বনের ইচ্ছা করিলে তাহাকে নিজ পরিবারবর্গের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিয়া তবে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইত; নচেৎ তাহাকে রাজাদেশে দণ্ডিত হইতে হইত। রাজকর্ম্মচারীরা এইরূপ লোককে ধৃত করিয়া তাহার দণ্ডের ব্যবস্থা করিতেন।

প্রকৃত বানপ্রস্থীদিগের জন্য রাজসরকার বিশেষ ব্যবস্থা করিতেন। বানপ্রস্থীরা অনেক বিষয়ে অকর ছিলেন। তাঁহাদের জন্য আবার ব্রহ্মসোমারণ্যাদির ব্যবস্থা থাকিত।

এবার সাধারণ গৃহী লোকের জীবনের কথা বলিব। দুঃখের বিষয়, অর্থশাস্ত্রে লোকের দৈনিক জীবনের কোন কথা নাই। বাৎস্যায়নের কামসূত্র ভিন্ন অন্য কোন গ্রন্থে উহার বর্ণনা নাই। তবে শেষোক্ত গ্রন্থের বর্ণনা পড়িয়া ও অর্থশাস্ত্রের নানা স্থান পর্য্যালোচনায় যাহা বুঝা যায়, তাহা হইতে দৈনিক জীবনের আভাস দিবার চেষ্টা করা যাইবে। সাধারণতঃ শয্যা হইতে উঠিয়া লোকে মুখ-প্রক্ষালনাদির পর সন্ধ্যা-বন্দনাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া, প্রাতরাশ সমাপনান্তে নিজ নিজ বৃত্ত্যানুযায়ী কার্য্যে মনোযোগ করিত। শ্রমজীবীর দল নিজ নিজ কার্য্যে নিযুক্ত হইত। ধনীরা বিশ্রম্ভালাপে পূর্ব্বাহ্ণ অতীত করিয়া, মধ্যাহ্নের প্রাক্কালে

স্নানাহারে মনোযোগ দিতেন। ধনী-দরিদ্র সকলেই নিত্য স্নান করিত (বাৎস্যায়ন বলেন, "নিত্যং স্নানং")। এই স্নানের আবার বিশেষ ব্যবস্থাও থাকিত। অনেক প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে স্নানাগারের উল্লেখ আছে। আবার লোককে স্নান করাইবার জন্য স্নাপক (পালিভাষায় 'নহাপক') নামক এক শ্রেণীর লোক থাকিত। স্নানকালে ধনী লোকেরা স্নেহচূর্ণ প্রভৃতি নানা প্রকার দ্রব্য ব্যবহার করিতেন ও তদন্তে গন্ধাদিতে শরীর লিপ্ত করিতেন।

স্নান ভিন্ন আবার উৎসাদনের ব্যবস্থা ছিল (বাৎস্যায়ন বলেন, "দ্বিতীয়ং উৎসাদনং")। সম্বাহকেরা লোকের গা টিপিত। স্নানান্তে আহারের ব্যবস্থা ছিল। আহারে বিশেষরূপ চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয়ের ব্যবস্থা থাকিত। আহারান্তে বিশ্রামের পর দরিদ্র লোকে নিজ কার্য্যে মনোযোগ দিত। ধনীর দল বা সৌখীন বিলাসীরা নিদ্রায় মধ্যাহ্ন অতিবাহিত করিতেন; তদন্তে তাঁহারা অপরাহ্নে গোষ্ঠী, মিত্রসমবায়, সমাপানকাদিতে গমন করিয়া আনন্দে কালাতিবাহিত করিতেন।

সাধারণ লোকের দৈনন্দিন জীবনের কথা অর্থশাস্ত্রে বিশেষ কিছু নাই। তবে রাজপ্রণিধি ও নিশান্তপ্রণিধি অধ্যায়ে রাজার দিনকৃত্যের অনেক কথা পাওয়া যায়। উক্ত অধ্যায়দ্বয় হইতে দেখা যায়, রাজা প্রত্যহ অতি প্রাতঃকালে উঠিতেন। প্রত্যূষে—এমন কি, রাত্রির শেষ অষ্টম ভাগে—প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া, পুরোহিত, আচার্য্য প্রভৃতির আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া, চিকিৎসক ও মৌহূর্ত্তিকের সহিত সাক্ষাৎ করার পর সবৎসা গাভী ও বৃষ প্রদক্ষিণপূর্ব্বক রাজা সভায় উপস্থিত হইতেন। দিবসের প্রথম অষ্টম ভাগে নিজ আয়-ব্যয় চিন্তা করিয়া, দ্বিতীয়ে সভাগৃহে প্রজাসাধারণের অভাব অভিযোগ শ্রবণ করিতেন। অতঃপর তৃতীয় ভাগে স্নান-ভোজন সমাপন করিতেন। স্নান-ভোজনান্তে যথাক্রমে অধ্যক্ষাদির সহিত কার্য্যচিন্তা, মন্ত্রী ও চারবর্গের সহিত পরামর্শ ও মন্ত্রণাদি সমাপন এবং তদন্তে সৈন্যাদি পরিদর্শন ও সেনাপতির সহিত সৈন্যাদির বিষয় আলোচনা করিয়া দিবা শেষ করিতেন।

রাত্রিকালের কর্ত্তব্যও ঐরূপ উক্ত অধ্যায়ে বিবৃত আছে। রাত্রির দ্বিতীয় অষ্টম ভাগে স্নান-ভোজন সম্পন্ন হইত। উহার পরের দুই ভাগ রাজা অন্তঃপুরে নিদ্রাদিতে কাটাইতেন; আর পঞ্চম ভাগ অতীত হইতে না হইতেই জাগরিত হইয়া স্বকার্য্য চিন্তায় মনোনিবেশ করিতেন।

রাজজীবনে ও প্রজাসাধারণের জীবনে অবশ্য অনেক প্রভেদ ছিল। বাহির হইতে সুখবিলাসপূর্ণ প্রতীয়মান হইলেও সে যুগের রাজেশ্বর অতি কঠোর জীবন অতিবাহিত করিতেন। রাজার জীবনে শান্তি কমই ছিল। প্রতিনিয়ত রাজ্যরক্ষার চিন্তা, প্রাণরক্ষার চিন্তা প্রভৃতিতে রাজমন অভিভূত হইত। মন্ত্রী, ভৃত্য, স্ত্রী, পুত্র, গুপ্তশত্রু, এই সকল হইতেই রাজার ভয়ের কারণ ছিল। নানা কারণে সাবধানতার বিশেষ প্রয়োজন হইত। স্বদেশীয় বা বিদেশীয় গুপ্তশত্রু খাদ্যে বিষ মিশাইতে চেষ্টা করিত। তজ্জন্য খাদ্যের বিশেষ পরীক্ষার প্রয়োজন হইত। অগ্রে খাদ্য অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া, উহার বর্ণাদি হইতে, উহাতে বিষ আছে কি না, তাহা দেখা হইত; পরে রক্ষিত পশুপক্ষীকে খাওয়াইয়া উহার নির্দ্দোষতা প্রমাণিত হইত। রাজান্তঃপুরে সর্পাদি ছাড়িয়া দিয়া বা অগ্নিপ্রয়োগে রাজাকে গুপ্তভাবে হত্যা করার সম্ভাবনা ছিল। তজ্জন্য নানাপ্রকার সাবধানতা অবলম্বন করা হইত। রাজ্ঞী বা অন্তঃপুরিকাদিগের উপরও সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনের উপায় ছিল না। অন্তঃপুরে নানাজাতীয় স্ত্রী পুরুষ, ষণ্ড, বামনাদি প্রহরীরূপে নিযুক্ত ছিল। বেশ্যা, যবনী ও ম্লেচ্ছরমণী ও বিশ্বস্ত প্রহরীর কার্য্য করিত। তাহারা পূর্ব্বে সমস্ত সন্ধান লইয়া রাজাকে সংবাদ দিলে, তবে রাজা মহিষীবিশেষের গৃহে আসিয়া সুরক্ষিতভাবে কালাতিপাত করিতেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র সর্ব্বসময়েই রাজগণের এইরূপ আত্মরক্ষার ব্যবস্থা দেখা যায়। রোমক সাম্রাজ্যে, মধ্যযুগের ফরাসী রাজ্যে, এমন কি, ইদানীন্তন কালের চীন ও তুর্ক সাম্রাজ্যে ঐরূপ ব্যবস্থা ছিল। যাঁহারা তুর্কদের ভূতপূর্ব্ব পদচ্যুত সম্রাট্ দ্বিতীয় আবদুল হামিদের অন্তঃপুর-জীবন পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের এ বিষয়ে আর অধিক কিছু বলিতে হইবে না।

সপত্নীবিদ্বেষ জর্জ্জরিতা বা পুত্রের সিংহাসন লাভার্থিনী রাজ্ঞীগণ গুপ্ত-ষড়যন্ত্র করিয়া স্বামীর প্রাণনাশে কুণ্ঠিত হইতেন না। অর্থশাস্ত্রে এইরূপ গুপ্তহত্যার উদাহরণ-স্বরূপ ভদ্রসেন কারুষ (করূষরাজাধিপতি), বিদূরথ ও জনৈক কাশীরাজের দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হইয়াছে। উক্ত নামগুলি বৃহৎসংহিতা, হর্ষচরিত ও অন্য দুইচারিখানি গ্রন্থেও পাওয়া যায়। এস্থলে এই সকলের বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। আত্মরক্ষিক প্রকরণ পাঠ করিলে এ বিষয়ে আরও অনেক কথা জানা যায়। রাজা প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইলে দশবর্গীয় প্রহরি পরিবৃত হইয়া যাইতেন। নানা বেশধারী চরবর্গ আশে-পাশে থাকিত। রাজার প্রাণরক্ষার এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। পুত্রগণ হইতেও রাজার বিশেষ ভয় ছিল। পুত্রদমনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অন্য অধ্যায়ে বিবৃত আছে।

দৈনন্দিন জীবনের সম্বন্ধে কিছু বলিতে চেষ্টা করিয়াছি। এখন সাধারণের আহারবিহার, আমোদপ্রমোদ, বিলাসিতা প্রভৃতির কথা বলিব।

আহার এখনকার দিনের মতই মিশ্রিত ছিল। অন্নভক্তাদি (পূর্ব্ব ভারতে), গোধূম বা যব হইতে প্রস্তুত রুটি বা পিষ্টক, শাক, ব্যঞ্জনাদি, দুগ্ধ, পায়স, ঘৃতোদন ও ক্ষীরোদন, ঘৃত, মাংস, মৎস্য, মদ্য, মিষ্ট প্রভৃতি লোকের আহার্য্য ছিল। তবে মনে হয়, তৎকালে আহার পরিমাণে অধিক ছিল এবং উহাতে মৎস্যমাংসাদি উৎকৃষ্ট আহার্য্যের প্রাচুর্য্য ছিল। সৌভাগ্যক্রমে এ সম্বন্ধে অর্থশাস্ত্রে আমরা কতকগুলি বিশেষ বিবরণ পাইয়াছি। উক্ত গ্রন্থে কোষ্ঠাগারাধ্যক্ষ অধ্যায়ে আমরা আহার্য্য দ্রব্য ও উহার পরিমাণ সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারি। ঐ অধ্যায়ে নানাজাতীয় শস্য, ফল, স্নেহ, মধু, ক্ষার, শাক ও লবণাদির কথা বিবৃত হইয়াছে। আমরা আরও জানিতে পারি, যে উৎপন্ন দ্রব্যের যে অংশ রাজা করস্বরূপ গ্রহণ করিতেন এবং রাজক্ষেত্র হইতে যাহা উৎপন্ন হইত তাহা প্রতিবৎসর রাজ-কোষ্ঠাগারে সঞ্চিত হইত। ইহার অর্দ্ধাংশ হইতে রাজভৃত্য বা পরিজনাদির ভরণপোষণ হইত, অপর বাকী অর্দ্ধাংশ প্রজাসাধারণের বিপদাপদে বা দুর্ভিক্ষ প্রভৃতির কালে প্রজার

প্রাণরক্ষার জন্য সঞ্চিত থাকিত। অসময়েই উহা ব্যয়িত হইত, নচেৎ নহে (ততোঽর্দ্ধমাপদর্থং রক্ষেৎ, জানপদানাম্ অর্দ্ধমুপভুঞ্জীত নবেন চানবং শোধয়েৎ)।

এই অধ্যায়ে প্রসঙ্গক্রমে সাধারণ ভদ্রলোকের তৎকালের আহার্য্য-পরিমাণ দেওয়া আছে। খাদ্যের পরিমাণের হিসাবে কৌটিল্য বলেন, যে আর্য্য পুরুষবিশেষের একবার ভোজনের জন্য এক প্রস্থ চাউলের অন্ন, সিকি প্রস্থ সূপ, আর সিকি প্রস্থ তৈল বা ঘৃত লাগে।* আর নিম্নশ্রেণীর লোকের খাদ্যের জন্য ঐ পরিমাণ চাউল এবং ⅙ প্রস্থ ঘৃত, তৈল ও সূপ হইলেই হইত। স্ত্রীলোকের পক্ষে পুরুষের ¾ ভাগ পরিমাণ খাদ্য ও বালকাদির পক্ষে উহার অর্দ্ধ যথেষ্ট বিবেচিত হইত।

অন্ন, ঘৃত, সূপাদি ভিন্ন দালের বিশেষ ব্যবহার ছিল; অর্থশাস্ত্রে মুদ্গ, মসুর, কুলত্থ, মাষ প্রভৃতি দালের ব্যবহারের ভূরি উল্লেখ দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন মৎস্য ও মাংসের ব্যবহার প্রচুর ছিল বলিয়া বোধ হয়। জীবন্ত মৎস্য ভিন্ন শুষ্ক মৎস্যের ব্যবহারের কথাও উল্লিখিত হইয়াছে। মাংসব্যবহার তখনকার দিনে প্রচুরপরিমাণে চলিত, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

অহিংসাবাদের প্রভাবে নিরামিষপ্রিয়তা বা শাক তৃণাদি ভোজনে শীঘ্র স্বর্গলাভের বাসনা তখন দেশে বিশেষ বলবতী হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। বৈদিক যুগে মাংসের প্রচুর ব্যবহার অনেকেরই জানা আছে। মাংসৌদন বা পলান্নবিশেষ অতি উৎকৃষ্ট খাদ্য ছিল। তৎপরবর্ত্তী যুগে জাতকাদিতে বহু প্রকার মাংসের ব্যবহার দেখা যায়। দুই একখানি জাতক পাঠে দেখা যায়, নিম্নশ্রেণীর মধ্যে নানাজাতীয় পশুর—এমন কি, বৃষ বলীবর্দাদির—মাংস ভক্ষণও চলিত। খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভগবান্ বুদ্ধ কোন ভক্তপ্রদত্ত বরাহমাংস ভক্ষণেও

* ১ প্রস্থ = ৩২ পল, ১ পল = ৪ কর্ষ, আর ১ কর্ষ = ৮০ রতি। ইহা হইতেই পরিমাণ বুঝিয়া লইন। বর্ত্তমানের ওজনে ইহা ১০১¾ তোলা অর্থাৎ ১ সের ৵০ ছটাকের উপর।

কুণ্ঠিত হন নাই।* এমন কি, উক্ত মাংসের অতিরিক্ত ভক্ষণজনিত উদরাময়েই তাঁহার মৃত্যু হয় বলিয়া লিখিত আছে। মহাভারতের বর্ণনায় ও বৈদ্যকশাস্ত্রে দেখা যায়, সেকালে মাংস শ্রেষ্ঠ আহার বলিয়া পরিগণিত হইত। মহাভারতের নানা পর্ব্বোক্ত নীতিগুলি হইতে জানা যায়, তৎকালে আঢ্যশ্রেণীর লোকের আহার মাংসপ্রধান ছিল; মধ্যবিত্ত লোকের আহার দুগ্ধঘৃতাদিপ্রধান ছিল; আর দরিদ্র লোকে শাকাদি-ভোজনে প্রাণ ধারণ করিত ("মাংসপ্রধানমাঢ্যানাং ক্ষীরপ্রধানং মধ্যানাং শাকপ্রধানং দরিদ্রাণাম" । যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ এবং দ্রৌপদী ও উত্তরার বিবাহের বর্ণনায় মাংস-ব্যবহারের বিশেষ উল্লেখ আছে। প্রাচীন যুগের উল্লেখ করিয়া মহাভারতকার রন্তিদেবের উপাখ্যান ও নিহত গবাদি পশুর রক্তে চর্ম্মণ্বতী নদীর উৎপত্তির কথা বিবৃত করিয়াছেন।

ক্রমে অহিংসা মতের প্রচার হয়। ব্রাহ্মণ ঋষিগণও ক্রমে জৈন-বৌদ্ধাদি মতের পোষকতা করেন। কিন্তু মনে হয়, অহিংসার মাহাত্ম্য-বর্ণনায়ও লোকে সহজে মাংসাহার হইতে বিরত হয় নাই। আজীবক ও অন্যান্য দলের লোক অহিংসাকে প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তথাপি মাংসাহার একেবারে সহজে বর্জ্জিত হয় নাই।

কৌটিল্যের যুগে মাংসের ভূরি-প্রচলন ছিল। যে অধ্যায়ের কথা বলা হইয়াছে, ঐ অধ্যায়েই কৌটিল্য মাংস-রন্ধনে ঘৃত-তৈলাদির পরিমাণ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজে অকারণ পশু-বধের বিরোধী ছিলেন এবং বহু স্থলে চাতুর্ম্মাস্য, পর্ব্ব দিবস ও সন্ধি দিবস প্রভৃতিতে পশু-বধ নিষেধ করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন তিনি স্ত্রী-পশু, বাল (অল্পবয়স্ক) পশু প্রভৃতির বধ একেবারে নিষেধ করিয়াছেন। উত্তরকালে অশোকের অনুশাসনগুলিতেও অবাধ পশু-বধ নিষিদ্ধ দেখা যায়। অশোক কতকগুলি পশুর বধ সম্পূর্ণ রহিত করেন; তিনি স্ত্রী-পশু বা অল্পবয়স্ক

* কাহারও কাহারও মতে উহা একরকম ব্যাঙের ছাতা। আজিও অনেক স্থানের লোকে উহা রাঁধিয়া খায়।

পশু-বধও নিষিদ্ধ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পর্ব্বাদিতে সর্ব্বপ্রকার পশু-বধ নিবারণ করেন। অশোক অহিংসাবাদে বিশ্বাসী হইলেও সহজে মাংসাহার ত্যাগ করেন নাই এবং যদিও উহা কমাইয়া দিয়াছিলেন, তথাপি বহু দিন পর্য্যন্ত তাঁহার রন্ধনাগারে দৈনিক একটি মৃগ ও দুইটি ময়ূর নিহত হইত।

মাংসাহারের ভূরি-প্রচলনবশতঃ যাহাতে উত্তম মাংস সরবরাহ হয়, রাজকর্ম্মচারীরা তাহার ব্যবস্থা করিতেন। "সূনাধ্যক্ষ" অধ্যায়ে জানা যায়, সূনাধ্যক্ষ এবং তাঁহার কর্ম্মচারীরা পচা বা দূষিত মাংস বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিতেন। রুগ্ন পশুর মাংসও বিক্রীত হইত না (মৃগপশূনামনস্থিমাংসং সদ্যোহতং বিক্রীণীরন্)। মাংসে ভেজাল দিলে বা দূষিতমাংস বেচিলে বিশেষ দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। গো ও অন্যান্য কতিপয় পশু অবধ্য বলিয়া পরিগণিত হইত (বৎসো বৃষো ধেনুশ্চৈষামবধ্যাঃ)।

মাংসব্যবহার এত প্রচলিত ছিল, যে সে যুগের লোক নানা প্রকার মাংসের খাদ্য প্রস্তুত করিয়া এখনকার হোটেলের ন্যায় স্থানে বিক্রয় করিত। অর্থশাস্ত্রে বহু স্থলে পাকমাংসিক নামে অভিহিত ব্যক্তিদের উল্লেখ দেখা যায়। পাকমাংসিকদিগের ন্যায় ঔদনিক, আপূপিক প্রভৃতি অন্নবিক্রেতারও বহু স্থলে উল্লেখ আছে। ইহারা বর্ত্তমানের hotel-keeperদিগের সহিত তুলিত হইতে পারে। অবশ্য দুই একটী কথা হইতে এ সম্বন্ধে কিছু নিশ্চিত করিয়া বলা কঠিন। তবে মনে হয়, উক্তরূপ ব্যবস্থা না থাকিলে উহাদের উল্লেখ পাওয়া দুর্ঘট হইত। ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের লোক উক্ত ক্রীত অন্ন ও মাংস ব্যবহার করিতেন কি না, তাহা বলা যায় না।

মাংসের মধ্যে অজ- এবং মেষ-মাংসের ভূরি-প্রচলন ছিল বলিয়া বোধ হয়। তবে আরণ্যজাতি ও উচ্ছৃঙ্খলদিগের মধ্যে সম্ভবতঃ শূকর- এবং কুক্কুট-মাংসও চলিত। কৌটিল্য কোশাভিসংহরণাধ্যায়ে যোনিপোষক-দিগের উল্লেখ করিয়াছেন এবং উক্তপ্রসঙ্গে কুক্কুট ও শূকরপোষকদিগের কথা বলিয়াছেন। উহা দেখিয়া মনে হয়, কুক্কুট এবং শূকরের মাংসও

যথেষ্ট ব্যবহৃত হইত। "অভক্ষ্যা গ্রাম্যকুক্কুটাঃ" কথাটি বোধ হয় কেবল শিক্ষিত ও সদাচারী ব্রাহ্মণেরাই মানিতেন। কেন না, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে কুক্কুট মাংসের বলকারিত্বের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং বাৎস্যায়নও গৃহকর্ত্রীর কর্ত্তব্যের মধ্যে কুক্কুটপালনের নির্দ্দেশ দিয়াছেন। বর্ত্তমানে আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণাদি ব্যতিরিক্ত নিম্নজাতীয় লোকেরা কুক্কুটমাংস ভোজনে বিরত নহে। শূকরমাংস ভোজন সম্পর্কেও ঐরূপ জাতকাদিতে উল্লেখ আছে। তবে উচ্চ বর্ণের ব্যক্তিগণ বোধ হয় উহা ব্যবহার করিতেন না। এখনও রাজপুতানা ও হিমালয়ের পার্ব্বত্য প্রদেশে শিকারলব্ধ বরাহমাংস অতি পবিত্র জ্ঞানে ভক্ষিত হইয়া থাকে।

সে যুগের মাংসরন্ধনাদির বিষয় অর্থশাস্ত্রে বা অন্য গ্রন্থে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। পরবর্ত্তী যুগের গ্রন্থাদিতে স্থালীপাক ও শূল্য মাংস উভয়েরই উল্লেখ দেখা যায়। সংস্কৃত নাটকে শূল্যমাংসভূয়িষ্ঠ আহারের কথা অনেকেরই পরিজ্ঞাত। মৃচ্ছকটিকে বহুবিধ মাংসরন্ধনের উল্লেখ আছে। প্রাচীন নলপাকদর্পণ প্রভৃতি গ্রন্থে মাংসাহারের পারিপাট্য প্রভৃতি অনেক বিষয় জানা যায়। মাংসৌদন অতি প্রাচীন। এমন কি, অথর্ব্ব বেদে উহার বহু উল্লেখ আছে। তবে পরবর্ত্তী যুগে অহিংসার প্রাধান্যবশতঃ মাংসাহার ও মাংস-ব্যবহার অনেক কমিয়া আসে। এখনকার যুগে পলান্নাদি মুসলমানদিগের দ্বারা গৃহীত হয় বলিয়াই অনেকের ধারণা।

মৎস্যাহারের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। অতি প্রাচীন যুগের ঋগ্বেদাদি গ্রন্থে অবশ্য মৎস্যের বিশেষ উল্লেখ নাই। কিন্তু কালে উহার ব্যবহার প্রচলিত হয়। মৎস্যবিক্রয়ী কৈবর্ত্তদিগের কথা বৈদিক সাহিত্যে বহু স্থানে উল্লিখিত আছে। স্মৃতিতেও বহু স্থলে ভক্ষ্যাভক্ষ্যের মধ্যে শুদ্ধ ও অশুদ্ধ মৎস্যের উল্লেখ আছে। জাতকাদিতে মৎস্যাহারের কথা বিলক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে উত্তর-পশ্চিমে মৎস্যাহার ঘৃণার চক্ষে দেখা হয়। ফলে বঙ্গদেশীয় মৎস্যাহারী ব্রাহ্মণ পশ্চিমবাসীর নিকট ঘৃণার পাত্র। দুর্ভাগ্যের বিষয়, পশ্চিমাঞ্চলের পণ্ডিতেরা নিজ দেশীয়

আচারের মোহেই অন্ধ হইয়া আছেন ; তাঁহারা স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করেন না ।

সুরাপান

মৎস্যমাংসাহারের রুচি-প্রচলনের সঙ্গে সুরাপানও বিশেষ প্রচলিত ছিল । বর্ত্তমানে এ কথা অনেকের নিকট অপ্রীতিকর হইতে পারে ; কিন্তু প্রকৃত কথা বলিতে গেলে সকলকেই প্রাচীন ভারতবাসিগণের সুরাপ্রিয়তার কথা স্বীকার করিতে হইবে । ব্রাহ্মণের পক্ষে অবশ্য সুরাপান মহাপাতক বলিয়া গণিত হইত এবং উহাতে মরণান্ত প্রায়শ্চিত্তের বিধান ছিল (সুরাং পীত্বা অগ্নিবর্ণাং সুরাং পিবেৎ) . মদ্যপানের বিষময় ফল উপলব্ধি করিয়াই এরূপ ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ হয় । বর্ত্তমান সামাজিক ইতিহাসেও উহা দেখা যায় । গত মহাযুদ্ধের সময় হইতে ইউরোপের কোন কোন দেশে মদ্যপান ও মদ্যবিক্রয় নিষিদ্ধ হইয়াছে । আমেরিকায় এ বিষয়ে বড়ই কঠোর বিধি প্রণীত হইয়াছিল । মদ্য প্রস্তুত—এমন কি, আমদানী—করিলেও কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল এবং বিদেশীয়ের সঙ্গে মদ্য থাকিলে উহা বাজেয়াপ্ত হইত, এ কথা অনেকেই জানেন ।

বর্ত্তমানে আমাদের সমাজের আচার মদ্যপানবিরোধী শিষ্ট লোকে মদ্যপান করিলে সমাজে নিন্দিত হন । অবশ্য কেহ কেহ গোপনে মদ্যপান করিয়া আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া থাকেন । মধ্যযুগে তন্ত্রের দোহাই দিয়া অনেক শাক্তের "কারণ-সেবা" চলিত । এখন 'কারণ' উঠিয়া গেলেও সভ্য ইংরাজী বিধিতে অনেক শিক্ষিত লোকে মদ্যপান করেন

প্রাচীন যুগে মদ্যপান-সম্পর্কিত বিধিব্যবস্থা ভিন্নরূপ ছিল । বৈদিক যুগে সুরাপান করা হইত । আয়ুর্ব্বেদাদিতে মদ্য, সুরা, আসব, অরিষ্ট প্রভৃতি প্রচলিত ছিল । স্বাস্থ্যের জন্য ও উপকারিতার জন্য অনেকেই ঋতুভেদে মদ্যবিশেষ সেবা করিতেন । সাধারণ গৃহী ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাদির মধ্যে উহা চলিত । সদাচারী ব্রাহ্মণেরা মদ্যপান ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন ।

কিন্তু সদাচারবিহীন উচ্চবর্ণ বা নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে মদ্যপান বিশেষ প্রচলিত ছিল।

অর্থশাস্ত্রের যুগে মদ্যের এত বহুল প্রচার ছিল যে, সুরাধ্যক্ষ নামে একজন উচ্চ রাজকর্মচারী সুরা উৎপাদন ও বিক্রয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন। নগরের বিশিষ্ট স্থানে, স্কন্ধাবারে ও গ্রাম্য প্রদেশের নানা স্থানে মদ্যের দোকান ছিল। মদ্য-ব্যবসায়ীদিগকে সরকারের অনুমতি লইয়া, উপযুক্ত কর দান করিয়া মদের দোকান খুলিতে হইত। যে কোন পরিমাণে মদ্য বেচার ব্যবস্থা ছিল না। লোকবিশেষে ও পরিমাণানুযায়ী মদ্য বেচিতে অনুমতি দেওয়া হইত। কেহ অধিক বেচিলে দণ্ডিত হইত। অর্দ্ধ কুড়ুব, অর্দ্ধ প্রস্থ বা এক প্রস্থের অধিক মদ কাহাকেও বেচিবার অনুমতি ছিল না। আর মদের দোকানে পুলিশের লোক বা গুপ্তচরেরা বসিয়া মদ্যপায়ীদের আচার ব্যবহার বা প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিত এবং সন্দেহস্থলে গ্রেপ্তার করিত। ঐরূপ দূষিত বা পচা মদ বেচিলে দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। মদের দোকানগুলিতে আরামে নেশা করিবার সুব্যবস্থা ছিল। বসিবার স্থান, আসন ও শয্যাদির ব্যবস্থা ছিল এবং একাংশে ফুল, ফল, খাদ্যাদি ও পানীয় রক্ষিত হইত। পাছে মাতাল অবস্থায় লোকের দ্রব্যালঙ্কারাদি চুরি যায়, তার জন্য পুলিশের লোকে সে সবের হিসাব রাখিত ও দোকানদারকে দায়ী করিত।

অর্থশাস্ত্রে মেদক, প্রসন্না, আসব, অরিষ্ট, মৈরেয় ও মধু, এই কয় জাতীয় মদ্যের উল্লেখ আছে এবং উহাদের প্রস্তুত বিধিও উল্লিখিত হইয়াছে। সাধারণতঃ ধান, গুড় বা চিনি ও তৎসঙ্গে ফল ও মসলাবিশেষ চোয়াইয়া মদ্য প্রস্তুত করা হইত। নানাপ্রকার উপাদান সংস্কৃত দিয়া উহাদের গন্ধ, বর্ণ বা শক্তির আধিক্য করা হইত। সহকার-সুরা, শ্বেত-সুরা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট মদ্য বিশেষ সমাদৃত ছিল বলিয়া বোধ হয়।

সেকালে মদের ব্যবসায় এখনকার মতই রাজহস্তে একচেটিয়া ছিল। তবে পর্ব্ব বা উৎসবাদিতে সামান্য কর দিয়া, লোকে ব্যবহারোপযোগী মদ্য বাটীতে প্রস্তুত করার অনুমতি পাইত। উৎসব, সমাজ ও যাত্রাদিতে

এইরূপ ব্যবস্থা ছিল (উৎসবসমাজযাত্রাসু চতুরহঃ সৌরিকো দেয়ঃ, তেষনুজ্ঞাতানাং প্রহবণান্তং দৈবসিকমত্যয়ং গৃহ্নীয়াৎ।—পৃ ১২১) এবং ঐগুলিতে মদ্যাদির বহুল ব্যবহার ছিল। নিম্নশ্রেণীর লোকে, বিশেষতঃ কর্ম্মকর ও ভৃত্যাদি যে বহু পরিমাণে মদ ব্যবহার করিত, তাহা অর্থশাস্ত্রে পাওয়া যায়। বারুণিজাতক এবং ইল্লীশজাতক প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার সমর্থক প্রমাণ আছে। ইল্লীশজাতকে এক দরিদ্র ব্যক্তি কিছু মদ ও মৎস্য কিনিয়া যাইতেছে, এইরূপ একটি চিত্র আছে। শকুন্তলা নাটকে ও অন্যান্য বহু গ্রন্থে আনন্দের সময়ে মদ্যপানের কথা আছে। ঐ গ্রন্থে নগরপাল ধীবরকে বন্ধনমুক্ত করিয়া, উহার পয়সায় মদের দোকানে চলিলেন, এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

সাধারণতঃ মদ্যপ্রস্তুতকারী জাতিরাই রাজতত্ত্বাবধানে মদ্য প্রস্তুত করিত। শুণ্ডাকার জাতির উৎপত্তি অতি প্রাচীন বৈদিক যুগে। অর্থশাস্ত্রে সুরা প্রস্তুত সম্পর্কে উক্ত ব্যবসায়ী জাতি বা সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে (তজ্জাতসুরাকিণ্বব্যবহারিভিঃ কারয়েৎ।—পৃ ১১৯)। আসব, অরিষ্টাদি চিকিৎসকেরাও ব্যবস্থা করিতেন, কৌটিল্য এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন (চিকিৎসকপ্রমাণাঃ প্রত্যেকশো বিকারাণামরিষ্টাঃ।—পৃ ১২০)।

ঐ যুগে ভারতের প্রদেশবিশেষ মদ্যের জন্য বিখ্যাত হইয়াছিল। কৌটিল্য কাপিশায়ন, হারহূরক প্রভৃতি দ্রাক্ষাজাত মধুমদ্যের নাম করিয়াছেন। পাণিনিতেও কপিশা দ্রাক্ষা ও মধুমদ্যের জন্য বিখ্যাত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে

আমোদ-প্রমোদ

এই ত গেল আহারাদির কথা। ইহার অতিরিক্ত বিশেষ কিছু অর্থশাস্ত্রে নাই। অতঃপর আমোদ-প্রমোদের কথা বলিব। তৎকালের সমাজে দেশকালানুযায়ী আমোদ-প্রমোদের বিশেষ ব্যবস্থা দেখা যায়। ধনী ব্যক্তিদিগের সুখ-বিলাসে সময় কাটাইবার জন্য বহুপ্রকার সম্মিলনের

ব্যবস্থা ছিল। এগুলি বিভিন্ন নামে অভিহিত হইত; যথা—সমবায়, গোষ্ঠী প্রভৃতি। অর্থশাস্ত্রে এ সম্বন্ধে বিশেষ বর্ণনা নাই। তবে বাৎস্যায়ন-কৃত কামসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থ ও মহাভারতাদি হইতে আমরা অনেক বিষয় জানিতে পারি। এই সম্পর্কে নিম্নলিখিতগুলির কথা উল্লেখ করা যায়। ১। সমবায়—গোষ্ঠী, সরস্বতীসমাজ। ২। সমাপানক। ৩। উৎসব সমাজ। ৪। দেবরাত্রি—পুণ্যরাত্রি। ৫। প্রেক্ষা—যাত্রা, প্রহসন। ৬। দ্যূতাগার—অক্ষাগার, দ্যূতক্রীড়া। ৭। অন্য প্রকার আমোদ—পক্ষিযুদ্ধ, পশুযুদ্ধ, পশুদৌড়ান। ৮। স্ত্রীলোকের সাহচর্য্যে আমোদ প্রমোদ—নৃত্যগীতাদি।

ধনী, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র জনগণের আমোদ-প্রমোদের জন্য নানাপ্রকার স্থায়ী ও অস্থায়ী সম্মিলনের ব্যবস্থা ছিল। উহাদের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতিও বিভিন্ন ছিল। দরিদ্র গ্রাম্যজনের জন্য গ্রামে মিলনের স্থান ছিল বলিয়া বোধ হয়। উহা এক স্থলে শালা নামে অভিহিত হইয়াছে। আর ধর্ম্মবিষয়ক সম্মিলনের জন্য আরামাদিরও ব্যবস্থা ছিল। কালক্রমে বৌদ্ধ, জৈন, আজীবক ও পরিব্রাজকগণের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ঐগুলি প্রকৃত ধর্ম্মস্থান অর্থাৎ বিহার, আরামাদিতে পরিণত হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐগুলির সম্মিলন ও তাহার উদ্দেশ্যাদি সম্পর্কে কোন গ্রন্থে কোন বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায় না।

উপরে বহুবিধ সমবায়ের নাম করিয়াছি। এখন উহাদিগকে শ্রেণীভেদে বিভক্ত করিয়া উহাদের সম্বন্ধে কিছু বলিবার চেষ্টা করিব। পূর্ব্বে বলিয়াছি, কতকগুলি সম্মিলন ছিল স্থায়ী ও ধনিলোকপ্রধান। বাৎস্যায়ন ইহাদিগকে কামী নাগরক নামে অভিহিত করিয়াছেন।

স্থায়ী ধনিপ্রধান কামীর আমোদস্থান হিসাবে গোষ্ঠী, সমবায় বা সরস্বতীসমাজ বা সমাপানকের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এখানে ধনী লোক (সাধারণতঃ) অপরাহ্নের পরে বা সন্ধ্যার প্রাক্কালে মিলিত হইতেন। সময়ে অহোরাত্রিক উৎসব চলিত; ইহাতে বেশ্যা, নটী ও নৃত্যগীতকুশলা সুন্দরীরাও উপস্থিত হইত। এখানে কাব্যচর্চ্চা, কলাচর্চ্চা,

নৃত্যগীতাদি নানাপ্রকার আমোদ-প্রমোদ চলিত। কাব্যসমস্যাপূরণ, কলাসমস্যাপূরণও চলিত।

সমাপানক এক স্থানে বা একের বাটীতে বা ক্রমে এক এক জনের বাটীতে হইত। উহাতে কাব্যকলা প্রভৃতি চর্চ্চার সঙ্গে মদ্যপানাদির বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। সমাপানক শব্দটি অর্থশাস্ত্রে ব্যবহৃত হয় নাই। তবে বাৎস্যায়নে উহার উল্লেখ ও বর্ণনা আছে। সেখানে নানাপ্রকার মধু, মৈরেয়, আসব ও সুরা ব্যবহৃত হইত। সঙ্গে বোধ হয় খাদ্যাদির ব্যবস্থা থাকিত। কৌটিল্যের ন্যায় বাৎস্যায়নও মধু, সুরা, আসব ও মৈরেয় প্রস্তুত করিবার বিশেষ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। আনুষঙ্গিক আরও অনেক প্রকার আমোদ-প্রমোদ চলিত। বাৎস্যায়ন-রচিত কামসূত্রের পাঠকমাত্রেই তাহা অবগত আছেন। দ্যূতক্রীড়া, কুক্কুট-যুদ্ধ, মেষ-যুদ্ধ, দোলায় দোলন, সহকারভঞ্জিকাদি নানা প্রকার ক্রীড়ায় কালাতিপাত করার ব্যবস্থা ছিল।

পূর্ব্বোক্ত গোষ্ঠীগুলিকে একরূপ club বা association বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। এগুলি ভিন্ন আবার সাময়িক উৎসব বা সমাজের অধিবেশন হইত। উৎসব শব্দের সাধারণ অর্থ আমরা জানি। তবে সমাজ বলিতে বহুপ্রকারের সম্মিলন বুঝায়। সমাজগুলি মাসান্তে, পক্ষান্তে বা শুভ দিনে সম্মিলিত হইত। অতিপ্রাচীন যুগে বোধ হয় সমাজের সহিত দেবদেবীবিশেষের পূজার নিকট সম্বন্ধ ছিল। সরস্বতী-গৃহে সমাজের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। আবার মহাভারতে বারণাবতে পশুপতির সমাজের কথা উল্লিখিত আছে (টীকা পশুপতেঃ সমাজঃ পূজার্থঃ মেলকঃ)। সাধারণতঃ সমাজগুলি পূজাকল্পেই অনুষ্ঠিত হইত। এখনও ভজনার্থ মিলন, এই অর্থে সমাজ শব্দ বঙ্গদেশের প্রদেশবিশেষে চলিত আছে। শ্রদ্ধেয় বন্ধুবিশেষের মুখে শুনিয়াছি, আজিও কাটোয়া অঞ্চলে বৈষ্ণবদিগের "সমাজ" হইয়া থাকে। পূজা উদ্দেশ্য প্রাথমিক হইলেও, পরে সমাজগুলি আমোদের স্থান হইয়া উঠে। জৈন ও বৌদ্ধ সাহিত্যে সমাজ, সমজ্যা প্রভৃতির ভূরি ভূরি উল্লেখ আছে। মহাভারতের

বহু স্থানে ও হরিবংশে সমাজের উল্লেখ আছে। সমাজগুলি যে মদ্যপান, নৃত্যগীতাদি, ইন্দ্রজাল বা দৈহিক শক্তি প্রদর্শনের স্থান ছিল, তাহা শিগালোবাদসুত্তন্ত হইতে জানা যায়। আবার অশোকের একটি অনুশাসন হইতে বুঝা যায় যে সমাজগুলিতে পশুবধ, মদ্যপান ও মাংসভোজন চলিত। তজ্জন্যই তিনি এগুলিকে রহিত করিবার চেষ্টা করেন। উৎসবগুলি প্রজ্ঞাত দিবসে হইত। সরস্বতী, গণেশ, দুর্গা প্রভৃতির উদ্দেশ্যে এক এক তিথিতে উৎসব হইত। ঘটানিবন্ধন প্রভৃতি উপলক্ষ্যে বাৎস্যায়ন ও তৎ-টীকাকার এ সম্বন্ধে বহু কথা লিখিয়াছেন (কামসূত্র, চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

এ ভিন্ন অনেকগুলি সাময়িক উৎসব ছিল। প্রতি মাসেই পর্ব্ব ও সন্ধিদিবসে দেবপূজা ও ভূতপূজার ব্যবস্থা ছিল। আর কার্ত্তিকী ও আশ্বিনী পূর্ণিমাতে এবং বসন্তে কোজাগর ও সুবসন্তক উৎসব অনুষ্ঠিত হইত। কালে উক্ত সময়গুলিতে বর্ত্তমানের পূজাদি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে। সে কথা অন্য স্থানে আলোচনার ইচ্ছা রহিল। বর্ত্তমানে কোজাগর লক্ষ্মীপূজা ও দোলযাত্রাদি প্রাচীন উৎসবের স্থান লইয়াছে।

এগুলি ভিন্ন দেবরাত্রি, পুণ্যরাত্রি, শঙ্করাত্রি প্রভৃতির অনুষ্ঠান হইত। শুভ তিথিতে দেববিশেষের উদ্দেশ্যে আমোদ-প্রমোদ চলিত। আবার মড়ক উপস্থিত হইলে সংকীর্ত্তন, কবন্ধদহনাদি নানা প্রকারের ব্যবস্থা ছিল।

এই সকল পূজা, পাঠ, উৎসবাদির সম্পর্কে আখ্যান, প্রেক্ষা, যাত্রা, প্রবহণাদির অনুষ্ঠান হইত। আখ্যানে বোধ হয় কোন অতীত ঘটনার কথা ব্যাখ্যাত হইত অথবা কোন দেবতা বা মহাপুরুষের কার্য্যাবলী বিবৃত হইত। প্রেক্ষা—যাহা হইতে আমাদের বর্ত্তমান থিয়েটার প্রভৃতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহারও অনুষ্ঠান এই সম্পর্কে। এই ব্যাপারের অনুষ্ঠান ভারতে অতি প্রাচীন। শৈলূষ শব্দ বৈদিক সাহিত্যে (শুক্ল যজুর্ব্বেদে) পাওয়া যায় ও নট শব্দ পাণিনিতে পাওয়া যায়। ভরতনাট্যসূত্রে ইন্দ্রধ্বজ স্থাপন ও তৎসঙ্গে অভিনয়ের কথা লিখিত আছে। ভারতীয়

থিয়েটারের উৎপত্তি লইয়া বহু পণ্ডিত এখন গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন। সে সম্বন্ধে এ স্থলে বিশেষ কিছু বলিব না। তবে এ কথা বলা যায় যে, প্রেক্ষা অতি প্রাচীন। প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্য ভিন্ন বৌদ্ধ-সাহিত্যে (ব্রহ্মজালসূত্রে ও অন্যান্য স্থানে) প্রেক্ষার কথা বিশদভাবে বর্ণিত আছে। অর্থশাস্ত্র পড়িলে মনে হয়, প্রেক্ষা অতি সাধারণ জিনিস ছিল। গ্রামের লোকে প্রেক্ষার অনুষ্ঠান করিত। আর ইহাতে সকলকেই চাঁদা দিতে হইত। কেহ চাঁদা না দিলে দণ্ডিত হইত এবং তাহাকে অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করিতে দেওয়া হইত না। এ কথা গ্রাম্যজীবনের বর্ণনায় বলিয়াছি।

যাত্রা ও প্রবহণের কথা অর্থশাস্ত্রের বহু স্থানে আছে। তবে উহার বিশেষ বর্ণনা কিছু নাই। মনে হয়, ঐগুলি প্রাচীন যুগে চলনশীল অভিনয় বা pageant এর মত কিছু ছিল সম্ভবতঃ বর্ত্তমানের রামলীলা বা সঙের সহিত উহার তুলনা করা যাইতে পারে।

অন্যান্য প্রকার ক্রীড়া ও আমোদ

পূর্ব্বোল্লিখিত প্রমোদগুলির সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক প্রকার ক্রীড়া, ব্যায়াম ও মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা ছিল। সেযুগেও কুহক ও নানা প্রকার ইন্দ্রজাল বা বাজি দেখান হইত। বংশনর্ত্তকগণ বাঁশের খেলা দেখাইত। চারণাদি গান করিয়া বেড়াইত। কুশীলবেরা স্থলে স্থলে অভিনয় করিয়া লোকের চিত্তরঞ্জন করিত। সময়ে সময়ে অশ্বাদি পশু দৌড়াইয়া লোকে আনন্দ করিত। Race খেলা ভারতে অতি প্রাচীন। বৈদিক সাহিত্যে অশ্বের race এর বহু উল্লেখ আছে। তবে কৌটিল্যে উহার উল্লেখ নাই। সেকালে পশুযুদ্ধ বিশেষ প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয়। পশুযুদ্ধের মধ্যে আবার ষণ্ড বা মেষের লড়াই ও কুক্কুটের লড়াই বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। ষণ্ডের যুদ্ধ এত লোকপ্রিয় ছিল যে, গভর্ণমেণ্টকে আইন দ্বারা দণ্ড দিয়া উহার প্রচলন কমাইবার চেষ্টা করিতে হইত। ঐরূপ শৃঙ্গী ও দংষ্ট্রী পশুদের যুদ্ধে ব্যাপৃত করিলে

বিশেষ দণ্ডাই হইতে হইত (২৩৩ পৃ°—শূন্যিদন্তৈাপায়স্তোস্তং যাতয়তঃ পূর্ব্বসাহসদণ্ডঃ)।

দ্যূতক্রীড়ার বিশেষ প্রচলন ছিল। স্থানে স্থানে অক্ষশালা স্থাপিত ছিল। কৌটিল্যের সময়ে দ্যূতাধ্যক্ষ নামে একজন রাজকর্ম্মচারী অক্ষশালা পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। যেখানে সেখানে দ্যূতক্রীড়ার আড্ডা থাকিত না। কেহ লুকাইয়া খেলিলে দণ্ডিত হইত। উক্ত ক্রীড়াগারে প্রবেশকালে কিছু প্রবেশ মূল্য দিতে হইত। আর কেহ বাজী রাখিয়া জিতিলে উহার শতকরা পাঁচ টাকা রাজসরকারে যাইত। খেলায় জুয়াচুরি বা প্রবঞ্চনা করিলে দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। দ্যূতের বিষময় ফল সকলেই জ্ঞাত ছিল। ঋগ্বেদে যেমন দ্যূতের কুফলের কথা আছে (ঋগ্বেদ ১০।৩৪), অর্থশাস্ত্রেও সেইরূপ দ্যূত একটি প্রধান ব্যসন বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে কৌটিল্যে উদাহরণস্বরূপ নল ও যুধিষ্ঠিরের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। কৌটিল্য আরও বলিয়াছেন যে, দ্যূত হইতেই সংঘে বা রাজকুলে ভেদ উপস্থিত হয় (বিশেষতশ্চ সংঘানাং সংঘধর্ম্মিণাং রাজকুলানাং দ্যূতনিমিত্তো ভেদঃ)।

পরিচ্ছদ

আমোদ-প্রমোদের পর পরিচ্ছদাদি সম্বন্ধে বলিব। এ বিষয়ে বিশেষ বলিবার নাই। গ্রীক ঐতিহাসিকদিগের নিকট হইতে আমরা এ সম্পর্কে যৎসামান্য জানি। আর অর্থশাস্ত্রেও সামান্য কিছু আছে। গ্রীকদিগের মতে প্রাচ্য দেশ বা মগধের অধিবাসিগণ ধুতি-চাদর ব্যবহার করিত। সাধারণ লোকে কার্পাসবস্ত্র পরিত। ধনীরা অবশ্য রেশম, ক্ষৌম বা জরির কাজ-করা বস্ত্র ব্যবহার করিত। বঙ্গদেশ সূক্ষ্ম বস্ত্রের জন্য বিখ্যাত ছিল। কাশীতেও উচ্চ শ্রেণীর বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইত। অপরান্ত প্রভৃতি নানা স্থানে কার্পাসবস্ত্রাদি প্রস্তুত হইত।

যোদ্ধপুরুষেরা কবচ, লৌহ-বর্ম্ম প্রভৃতি ব্যবহার করিতেন আয়ুধাগার-বর্ণনায় উহাদের সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। আর শীতবস্ত্রের

জন্য উর্ণানির্ম্মিত কম্বলাদি হিমালয়ের পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রস্তুত হইত। স্ত্রীলোকের বেশভূষার পারিপাট্য ছিল। বহু বর্ণের নানা চিত্রিত বস্ত্র, নানা প্রকার আচ্ছাদন-বস্ত্র ও জামার বহু প্রচার ছিল। স্ত্রীপুরুষের পাতুকা-ব্যবহার সুপ্রচলিত ছিল, গ্রন্থান্তরে উহা দেখা যায়। স্মৃতিতেও উহার উল্লেখ আছে। তবে অর্থশাস্ত্রে উহার বিশেষ বিবরণ নাই।

গণিকা ও বেশ্যা

আমোদ-প্রমোদাদির প্রধান অঙ্গস্বরূপ সেই যুগে সমাজে বেশ্যার প্রশস্ত স্থান ছিল। বর্ত্তমানে বেশ্যার নামে সুরুচিসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই নাসা কুঞ্চন করিবেন। কিন্তু সে যুগের লোকের মনোবৃত্তি অন্যরূপ ছিল। বেশ্যা, বিশেষতঃ গণিকা, সমাজে উচ্চ স্থান পাইত। প্রত্যেক নগরেই গণিকা রাজা-কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া সমাদৃত হইত। বৌদ্ধ-সাহিত্যের পাঠকেরা কোশল, বৈশালী, শ্রাবস্তী প্রভৃতি নগরের প্রধানা বেশ্যার কথা অবগত আছেন। তাহাদের স্থান এত উচ্চে ছিল যে, ভগবান্ বুদ্ধ অম্বপালীর নিমন্ত্রণ-গ্রহণে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। অনেক গণিকা ও বেশ্যা তাঁহার সংঘে স্থান পাইয়াছিল। অভয়মাতা, অঙ্কপালী প্রভৃতি গণিকার নাম থেরীগাথায় উল্লিখিত আছে। পৃথিবীর অন্য অনেক প্রাচীন সভ্যতায় গণিকার এইরূপ উচ্চ স্থান দেখা যায়। ব্যাবিলোনিয়ায় গণিকার স্থান উচ্চ ছিল। সীরিয়ার অনেক স্থানে স্ত্রীলোকদিগকে জীবনে একবার ধর্ম্মের নামে সাধারণে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করা হইত। সুসভ্য গ্রীসদেশে অ্যাস্‌পেসিয়ার সঙ্গ করিতে সক্রেটিস ও পেরিক্লিসের ন্যায় লোকও কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হইতেন না। উহার গৃহে রাজনীতি, দর্শন ও সমাজনীতির চর্চ্চা হইত। অ্যাস্‌পেসিয়া ও তাহার সমসাময়িক অনেক গণিকা সুপণ্ডিত ও সদালাপী ছিল।

বাৎস্যায়নের গণিকাধ্যায়ে দেখা যায়, তিনি স্বৈরিণীদিগকে গণিকা, গণ্ডদাসী, বেশ্যা প্রভৃতি পর্য্যায়ে বিভক্ত করিয়া, গণিকাদিগকে উচ্চ স্থান

দিয়াছেন। গণিকারা শিক্ষিতা, কবিত্বকুশলা ও কলাভিজ্ঞা হইত বলিয়া বুঝা যায়। সে যুগে এইরূপ সামাজিক অবস্থা ছিল। এমন কি, কবিবর শূদ্রকনৃপতি মৃচ্ছকটিকনাটকে গণিকাদারিকা বসন্তসেনাকে নায়িকা করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। উক্ত গ্রন্থের পাঠকগণ বসন্তসেনার রূপ, গুণ, ধন, দয়া-দাক্ষিণ্যাদির বিষয় অবগত আছেন। চারুদত্তের বিপদবসানে অবন্তীরাজ বসন্তসেনাকে বধূশব্দে আহ্বান করেন।

অর্থশাস্ত্রে গর্ভদাসী, রূপাজীবা ও গণিকার উল্লেখ আছে। গণিকাদিগের তত্ত্বাবধানের জন্য গণিকাধ্যক্ষ নামে একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকিতেন। প্রতিনগরেই একজন বেশ্যাকে গণিকানামে অভিহিত করা হইত; প্রতিগণিকাও একজন থাকিতেন। প্রতিগণিকা শব্দটির ব্যবহারের উদ্দেশ্য বুঝা যায় না। গণিকারা রাজতত্ত্বাবধানে থাকিত এবং উহাদের শুল্কাদি রাজা নিরূপণ করিয়া দিতেন। কেহ প্রবঞ্চনা করিলে, উহাদের বিত্তাদি অপহরণ করিলে বা আঘাতদ্বারা উহাদের রূপ নষ্ট করিলে বিশেষ দণ্ডার্হ হইত। গণিকাদিগকে সময়ে সময়ে রাজসভায় উপস্থিত থাকিতে হইত এবং রাজাদেশমত শুল্কাদি গ্রহণ করিয়া ব্যক্তিবিশেষে আত্মসমর্পণ করিতে হইত। রাজাদেশ-লঙ্ঘনে দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। বেশ্যা ও গণিকাদির রাজসরকারে বিশেষ কর দিতে হইত। রূপাজীবারা মাসে দুই দিনের বেতন করস্বরূপ দান করিত। গণিকাদির পুত্রেরাও শিক্ষিত হইয়া কুশীলব বা রঙ্গোপজীবী হইত। আট বৎসর বয়স হইতে বেশ্যাদিগকে রাজসম্পত্তি রূপে রাজার তত্ত্বাবধানে থাকিতে হইত। কিন্তু ২৪,০০০ পণ নিষ্ক্রয় দিলে উহারা স্বাধীন হইতে পারিত। যাহারা ঐরূপ নিষ্ক্রয় দানে অসমর্থ হইত, বৃদ্ধাবস্থায় তাহারা রাজান্তঃপুরে ধাত্রী বা পাচিকা নিযুক্ত হইত।

বেশ্যার সম্পত্তি তাহার মাতার তত্ত্বাবধানে থাকিত। বেশ্যারা রাজদরবারে ছত্রদণ্ড প্রভৃতি ধারণ করিত, রাজাকে ব্যজন করিত বা সভায় নৃত্যগীতাদি করিত; তজ্জন্য তাহাদের বেতনের ব্যবস্থা ছিল। রাজান্তঃপুরে বা অন্যত্র বেশ্যারা গুপ্তচররূপে নিযুক্ত হইত। বেশ্যাচরের

কথা গ্রীক ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থে ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের বহু স্থানে উল্লিখিত আছে।

বেশ্যাদিগকে তাহাদের দৈনন্দিন আয়ের এবং সম্পত্তির কথা রাজসরকারে জ্ঞাপন করিতে হইত। উত্তরাধিকারীর অভাবে বেশ্যার সম্পত্তি রাজসরকারে গৃহীত হইত। এইরূপ ব্যবস্থা কেবল ভারতে নহে, মধ্যযুগের অনেক দেশেই ছিল। ফ্রান্স দেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয় মধ্যযুগে বেশ্যাদিগের আয় হইতে প্রচুর কর লাভ করিতেন।

বাৎস্যায়নের কামসূত্র গ্রন্থে বেশ্যা ও গণিকার অনেক কথা আছে। উহাদিগের শিক্ষার্থ কামসূত্রের গ্রন্থবিশেষ রচিত হয়। দত্তকাচার্য্যের নাম এ হিসাবে বিখ্যাত। বেশ্যার স্থান ঐ যুগে ও তৎপরবর্তী যুগে উচ্চ ছিল। যাত্রার সময়ে উহাদের দর্শন শুভ বলিয়া পরিজ্ঞাত হইত। মিলিন্দপ্রশ্নে এক বেশ্যাকে উচ্চ স্থান দেওয়া হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অর্থশাস্ত্রের সামাজিক আদর্শ

লোক-চরিত্র

মৌর্য্যযুগের সমাজ-সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছি। অতঃপর লোক-চরিত্র বা শীল-সম্বন্ধে এবং দারিদ্র্য, বিলাসিতা প্রভৃতির বিষয়ে কিছু আলোচনা করিব। লোকচরিত্র বলিলে যে কেবল জনসাধারণের সম্বন্ধে উহা প্রযোজ্য হইবে, তাহা নহে। অর্থশাস্ত্র রাজ্যশাসন প্রভৃতি সংক্রান্ত বিষয় লইয়া লিখিত; উহাতে সাধারণ লোকের কথা বড় কম। তবে উক্ত গ্রন্থপাঠে তৎকালের লোক-প্রকৃতির বিশেষত্ব কিছু জানা যায় না বলিলে ঠিক হইবে না। সাধারণতঃ প্রত্যেক যুগেই মানবের মন কোন একটি বিষয়ে আকৃষ্ট হয়—এক দিকে ধাবিত হয়। অন্য বৃত্তিগুলি যে একেবারে নিরুদ্ধ হইয়া যায়, তাহা নহে; তবে অন্য একটি বা দুইটির প্রাবল্যবশতঃ সেগুলির প্রাধান্য তত বুঝিতে পারা যায় না। জগতের ইতিহাসে এইরূপ যুগে যুগে এক একটি ভাবের প্রাবল্য দেখা যায় এবং এইগুলিকে যুগধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত করা হয়। দেখা যায়, কোন যুগে দেশে ধর্ম্মচর্চ্চার স্রোত বহে লোক ধর্ম্ম লইয়া আন্দোলনে মত্ত হয়। আবার তৎপরবর্ত্তী যুগে জনগণ ধর্ম্ম হইতে মন সঙ্কোচিত করিয়া অন্য দিকে নিযুক্ত করে। কোন যুগে যুদ্ধবিগ্রহে, কোন যুগে বা বাণিজ্য ও ধনলাভে মানবের মন চালিত হয়। আবার কোন যুগে একেবারে জড়তা আসিয়া পড়ে। এইরূপে বিভিন্ন স্রোতের ঘাতপ্রতিঘাত, নিরোধ বা প্রবলতা চলিতে থাকে।

অর্থশাস্ত্রের যুগের বৈশিষ্ট্য আছে। অর্থশাস্ত্র-রচনারও একটি বৈশিষ্ট্য আছে। আবার এই যুগের পূর্ব্বের ও অব্যবহিত পরের যুগও ইতিহাসে

বিশেষত্বহীন নহে। ইহার পূর্ব্বের যুগে ধর্ম্মের আন্দোলন লইয়া লোকে মাতিয়াছিল। একরূপ বলিতে গেলে বৈদিক যুগের শেষ হইতেই লোকে পরলোক ও ইহলোকের সুখদুঃখের কারণ প্রভৃতির অনুসন্ধিৎসায় নিযুক্ত হইয়াছিল। জগতের দুঃখ, ইহার নিবারণের উপায় প্রভৃতি নানা বিষয়ে লোকের মন চালিত হইয়াছিল। জগৎ যে দুঃখের স্থান, কর্ম্ম যে কেবল দুঃখেরই কারণ, কর্ম্মফলে যে মানব পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে, ঐযুগে এই সকল বিশ্বাস মানবের মনে আধিপত্য করিয়াছিল। এই সকলের ফলে দেশে দুঃখবাদ (pessimism) প্রবল হইয়া উঠে।

অবশ্য ইহার বিপরীতবাদী ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকও ছিল। চার্ব্বাক এবং বার্হস্পত্য-সম্প্রদায়ের কথা সকলেরই জানা আছে। কিন্তু ইহাদের প্রকৃত ইতিহাস বা বিস্তৃত বিবরণ আমরা কিছু জানি না। তবে কতিপয় বিরুদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রদত্ত ইহাদের শ্লেষাত্মক নাম ও বিবরণ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। চার্ব্বাক (অর্থাৎ চর্ব্বণকারী)* মতাবলম্বীরা প্রত্যক্ষ ভিন্ন জ্ঞান স্বীকার করিতেন না। পার্থিব ইন্দ্রিয়সুখ ভিন্ন জীবনের আর কোন উদ্দেশ্য তাঁহারা অস্বীকার করিতেন। তাঁহাদের মতে যে কোন উপায়ে শরীরের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করা জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। দেহ বিনাশের সঙ্গেই জীবের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায়। জগতের নানাবিধ মৌলিক দ্রব্যের সংঘাতে জীবন বা জ্ঞানের উৎপত্তি। ঈশ্বরাদি কিছুই নাই। উক্ত সম্প্রদায়ের অনুসরণকারীরা মোটামুটি এই প্রকার মতের দ্বারা পরিচালিত হইতেন।

এক দিকে যেমন চার্ব্বাকপন্থীরা ঐহিক সুখভোগের সমর্থক ছিলেন, তদ্রূপ বিরুদ্ধবাদী পরিব্রাজকাদির দল আবার সংসারকে একেবারে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। তাঁহাদের চক্ষে কর্ম্মজগতের কোনই স্থান ছিল না। তাঁহারা লোককে গৃহত্যাগ করিতে, সন্ন্যাস লইতে বা কঠোরভাবে জীবন যাপন করিতে শিখাইতেন। আদিম বৌদ্ধধর্ম্মেও এই মত গৃহীত হইয়াছিল। ইহাতে গৃহী বা গার্হস্থ্যের কোন স্থান ছিল না। দুঃখের

* ঐরূপ কণাদ বা কণভুক্ ইত্যাদি বিদ্রূপাত্মক নাম উল্লেখযোগ্য।

বিষয়, এই সকল শিক্ষার উত্তরকালে বিষময় ফল ফলিয়াছিল। সমাজে উহার প্রভাবে যে দুর্নীতি ঘটিয়াছিল, তাহার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ঐ মতের একটি বিশেষ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। কৌটিল্য কাঠোর্য্যবাদের (rigorism) পরিপন্থী। প্রাচীনতর ধর্ম্মসূত্র-গুলিতে এই প্রতিবাদের মূল পরিলক্ষিত হয়। যাহা হউক, এ বিষয়ে কৌটিল্যের মতটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন,—

"ন নিঃসুখঃ স্যাৎ। ধর্ম্মার্থাবিরোধেন কামং সেবেত।"

এই হিসাবে ভারতের সামাজিক ইতিহাসে অর্থশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্রকারের স্থান অতি উচ্চে। কৌটিল্যের মতে মানবের ঐহিকজীবনে সুখের প্রয়োজন। সুখ না থাকিলে, কামবিহীন জীবন নিঃসার হইয়া পড়ে। কাষ্ঠবৈরাগ্যের ফলে মানব কর্ম্ম ভুলিয়া যায়। সমাজ বিলুপ্ত হয়; উৎকর্ষ বিনষ্ট হয়।

এই প্রতিক্রিয়ার সহিত আবার ভারতীয় রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। ইহারই ফলে ভারতবাসী রাজনৈতিক জগতে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল—কর্ম্ম জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল।

সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু লোকের মানসিক ভাবেরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। লোকে বর্ত্তমান যুগের মত ঐহিক উন্নতির চেষ্টায় মন দিয়াছিল এবং অনেকটা ধর্ম্মভয়হীন হইয়া পড়িয়াছিল; তৎকালীন লোকচরিত্রে উহা বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। এক দিকে জড়তা বিলুপ্ত হইয়াছিল, অপর দিকে আবার অর্থৈষণার প্রভাবে অনেকটা নৈতিক অবনতি ঘটিয়াছিল।

লোকচরিত্রের এই নৈতিক অবনতি পর্য্যালোচনার বিষয়। রাজনীতি-ক্ষেত্রেও ইহার যথেষ্ট প্রভাব দেখা গিয়াছিল। অর্থশাস্ত্রের পাঠকমাত্রেরই ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ঐ যুগের অধিকাংশ রাজনীতিজ্ঞের মধ্যে প্রাচীন অর্থশাস্ত্রকার-নির্দিষ্ট নৈতিকতার আদর্শের একেবারে অভাব দেখা যায়। এই সময়ে সকলেই ছলে, বলে বা কৌশলে অভীষ্ট-সিদ্ধি বা শত্রুনিপাত করিতে উদ্যোগী। রাজপুত্রদিগকে দমনের জন্য কেহ বা উহাদের মদ্যপানাদিতে আসক্ত করিবার উপদেশ

দিয়াছেন কেহ বা মোহচূর্ণাদির দ্বারা উহাদের সংজ্ঞা বিলোপ করিয়া, বন্দী করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

সকল নীতিকারই ছদ্মবেশধারী চার-প্রয়োগের উপদেশ দিয়াছেন। কৌটিল্যও ঐ মতের সমর্থন করিয়াছেন। আপাতদৃষ্টিতে তিনিও প্রায় একই মতাবলম্বী। তবে ভাল করিয়া দেখিলে তাঁহার একটু বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। যদিও অনেকে তাঁহাকে Machiavellir সহিত তুলনা করিয়া থাকেন, তথাপি মনোযোগের সহিত তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখিলে তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত অনেক উচ্চ আসনে বসাইতে হয়। সে সব বিষয় অন্য স্থানে আলোচনা করিয়াছি।

অবশ্য রাজনৈতিকদিগের প্রকৃতি বা মত লইয়া জনসাধারণের নৈতিক উৎকর্ষ বা অপকর্ষের বিচার করা যায় না। উহাতে বিশেষ অবিচার বা ভ্রান্তি ঘটিবার সম্ভাবনা। তবে মোটের উপর এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, সে যুগের লোকের নৈতিক আদর্শ উচ্চ ছিল না। যে সমাজে গুপ্তহত্যা, বিষদান, অগ্নিদান প্রভৃতির প্রশস্ত স্থান থাকে এবং সে সমাজের রাজনৈতিকেরা ছলে, বলে বা কৌশলে কার্য্যোদ্ধার করিতে কুণ্ঠিত হন না, সে সমাজের লোকের নৈতিক আদর্শ যে বড় উচ্চ নহে, তাহা একবাক্যে বলা যাইতে পারে

ব্যভিচার

মৌর্য্যযুগে সমাজের যৌন আদর্শও বিশেষ উচ্চ ছিল না। একে ত সমাজে আট প্রকার বিবাহ ও দ্বাদশ প্রকার পুত্র প্রচলিত ছিল। তাহার উপর আবার হীন বিবাহে বিবাহ-মোক্ষ ও পুনরায় সম্বন্ধস্থাপনের ব্যবস্থা ছিল ইহা সত্ত্বেও ব্যভিচারের মাত্রা যে বড় কম ছিল, তাহা নহে। অর্থশাস্ত্রের পাঠকেরা ইহা পরিজ্ঞাত আছেন কৌটিল্য কণ্টকশোধন অধিকরণের কন্যাপ্রকর্ম ও অতিচারদণ্ড প্রকরণে নানাপ্রকার যৌন ব্যভিচারের উল্লেখ করিয়াছেন

কন্যাপ্রকর্ষ অধ্যায়ে দেখা যায় যে, বিবাহ-বয়স অতিক্রম করিবার পর কন্যা পরগামিনী হইলে সমাজে উহা দোষাবহ হইত না। তবে সমাজ এই সকল স্থলে প্রাতিলোম্যের জন্য বিশেষ দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। নিম্নবর্ণা স্ত্রী উচ্চবর্ণের পুরুষে আসক্ত হইলে উহার অবশ্য দণ্ড হইত। কিন্তু উচ্চবর্ণা স্ত্রী নীচগামিনী হইলে উহার কঠোরতর শাসনের ব্যবস্থা ছিল। নানা প্রকার কায়িক দণ্ড, রাজদণ্ড, এমন কি ভীষণ মৃত্যুদণ্ডের পর্য্যন্ত ব্যবস্থা ছিল ব্যভিচারিণীর দণ্ড ত হইতই; গর্ভপাতিনী, স্বামীকে বিষদায়িনী, অগ্নিদাত্রী প্রভৃতিরও কঠোর দণ্ডের বিধান ছিল।

মোটের উপর মনে হয়, বর্ত্তমানের সমাজ অপেক্ষা ব্যভিচার প্রবল ছিল। নানা শ্রেণীর দূতীর প্রয়োগের উল্লেখ দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে প্রব্রজিতা দূতীর কথা উল্লেখযোগ্য। দুই এক স্থলে ব্রাহ্মণীজারকে বিশেষ ঘৃণার চক্ষে দেখা হইয়াছে।

ব্যভিচার-বিষয়ক আইন কঠোর এবং ব্যভিচারিণীর স্থান সমাজে হীন হইলেও মনে হয়, ব্যভিচার বলিতে আমরা যেরূপ সামান্য অপরাধকে পর্য্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখি, তখন এরূপ কঠোর আদর্শ ছিল না। ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা যে সকল অপরাধে স্ত্রীলোকের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়াছেন ও তদন্তে সমাজে উহার পুনর্গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছেন, এখন উহাতে সমাজে চিরন্তন পাতিত্যই ঘটিয়া থাকে। সামান্য সামান্য অপরাধ—যাহাতে আমাদের সমাজে পাতিত্য ও ত্যাগের ব্যবস্থা আছে, কৌটিল্যে তাহাতে কেবল অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা দেখা যায়। পরপুরুষ সম্ভাষণাদি সামান্য সংগ্রহণাপরাধ-স্থলে অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। সমাজ ঐরূপ দণ্ড দিয়াই ক্ষান্ত হইত। তখনকার যুগে এই সকল অপরাধে "রজসা শুধ্যতে নারী" এই ব্যবস্থা অনুসারে দোষ ক্ষালন হইত। পরপুরুষজনিত গর্ভ-স্থলে অনেক স্মৃতিকার এক বৎসর অধঃশয্যা ও কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি ব্যবস্থা করিয়াছেন।

এখনকার যুগে সমাজ উন্নত হইয়াছে। সামাজিক আদর্শও অনেক উচ্চ হইয়াছে। ক্ষেত্রজ পুত্রাদি এখন জারজ বলিয়াই পরিগণিত।

কানীন, সহোঢ়, পৌত্র, শূদ্রোৎপন্ন প্রভৃতির সমাজে কোন স্থানই নাই। কুণ্ড, গোলকাদি সন্তান এখন কেহই নিজের বলিয়া গণ্য করে না। সেই হিসাবে আমরা অপেক্ষাকৃত সামান্য অপরাধকে ব্যভিচার ধরিয়া থাকি। তখন আদর্শ হীন ছিল। এখনকার মত সামান্য অপরাধকে অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হইত না। কৌটিল্য পুত্রোৎপাদনে অসমর্থ রাজাকে ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদনের ব্যবস্থা দিয়াছেন।

বিলাসিতা

বিলাসিতার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এখন সাধারণ সামাজিক জীবনের আদর্শ হিসাবে উহার পুনরুল্লেখ করিব। লোকের জীবনে বর্ত্তমানের অপেক্ষা ভোগস্পৃহা বলবতী ছিল। সেযুগের লোকে দারিদ্র্যের পেষণে থাকিয়া ভোগ ভুলিয়া যায় নাই। জীবন-সংগ্রাম এত কঠোর হয় নাই। কাজেই লোকে অবসর পাইত। সময় অতিবাহনের জন্য নানা প্রকার আমোদ-প্রমোদ প্রচলিত ছিল। ঘোড়দৌড়, পশুযুদ্ধ, দ্যূতক্রীড়া, মদ্যপান, গোষ্ঠ-বিহারাদির কথা উল্লেখ করিয়াছি। নট, নর্ত্তক, গায়ন, বাগ্‌জীবন (ভাঁড়), গন্ধকারী প্রভৃতির কথাও বলিয়াছি। সমাজে বিলাসিতা প্রবল থাকায় এই সকল শ্রেণীর লোকের স্থান ছিল। উৎসাদনের জন্য সংবাহক (গা টিপিবার লোক), স্নাপক (যাহারা স্নানে সাহায্য করে) *, মাল্যকার, আস্তরক প্রভৃতির উল্লেখ দেখা যায়। বৈদিক যুগ হইতেই ইহাদের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়।

সংস্কার

তখনকার লোকে আজকালকার মতই নানা প্রকার কুসংস্কারাদিতে আস্থা স্থাপন করিত। জ্যোতিষগণনা, ভবিষ্যগণনা, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন,

* রামায়ণে স্নান-সম্পর্কে উৎসাদকের উল্লেখ আছে।

মারণাদি কার্য্য, অভিচার-ক্রিয়া প্রভৃতিতে তখনকার লোকের বিশেষ আস্থা ছিল। লোকে ভূত, প্রেত, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতিতে বিশ্বাস করিত, নাগাদির পূজা করিত এবং নানা প্রকার দেব-দেবীর সন্তোষার্থ উপহারাদি দান করিত।

আবার বিপদের সময়ে অনেক লোকে মিলিয়া নানা প্রকার ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিত। শ্মশানে কবন্ধ-দাহন, শ্মশানে গো-দোহন, শকরাত্রি, দেবরাত্রি প্রভৃতির কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

তখনও লোকের অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস ছিল। লোকে সাধু, ফকির প্রভৃতিতে আস্থা স্থাপন করিত। লোকে শুভাশুভক্ষণ, গ্রহনক্ষত্রের প্রভাবাদি সমস্তই মানিত। তাহারা দেবপূজা করিত; প্রতিমা গড়িত; সিদ্ধ তাপসাদি দ্বারা শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করাইত। এ সকল বিষয়ে আমাদের সঙ্গে সেযুগের লোকের বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। তবে কোন কোন বিষয়ে প্রভেদ ছিল।

ভক্ষ্যাভক্ষ্য ও জলাচরণীয়ত্ব

ভক্ষ্যাভক্ষ্য ও সামাজিক সম্বন্ধাদি লইয়া তখন অনেক মতামত প্রচলিত ছিল। তবে এখনকার মত উহা এত কঠোর ছিল না। উহার কারণ ও উৎপত্তি-সম্বন্ধে প্রসঙ্গক্রমে কয়েকটি কথা বলিব।

আহার সম্বন্ধে পূর্ব্বে বলিয়াছি। সে যুগে মৎস্য-মাংসাহার বিশেষ-রূপে প্রচলিত ছিল। জাতকে বরাহমাংস, কুক্কুটমাংস, এমন কি স্থানবিশেষে বা জাতিবিশেষে, গোমাংসাহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভক্ষ্যাভক্ষ্য-সম্বন্ধে ধর্ম্মসূত্রগুলিতে অনেক কথা পাওয়া যায় প্রথমতঃ আমরা দেখিতে পাই—

(ক) কতকগুলি পশুর মাংস ও কতকগুলি মূল কন্দ অভক্ষ্য বলিয়া পরিগণিত হইত। পশুর মধ্যে মাংসাশী জন্তু মাত্রই অভক্ষ্য ছিল। নখরবিশিষ্ট জলচর এবং একক্ষুরবিশিষ্ট জন্তুরাও অভক্ষ্য বলিয়া পরিগণিত হইত। সাধারণতঃ মেষ ও ছাগ, বন্য বরাহ, শিকারলব্ধ মৃগাদি, শশক,

শল্লকী, গোধা ও অপর কতকগুলি জন্তুর মাংস পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হইত। গ্রাম্য কুক্কুটমাংস ধর্ম্মসূত্রে অখাদ্য বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ঐরূপ রশুন, কবক প্রভৃতি কতিপয় বস্তুও অভক্ষ্য বিবেচিত হইত।

(খ) দ্বিতীয়তঃ, কয়েক শ্রেণীর লোকের অন্ন (উহাদের অর্থে প্রস্তুত) অখাদ্য বলিয়া গণিত হইত। ধর্ম্মসূত্রগুলিতে ও মনু প্রভৃতি সংহিতাকারের গ্রন্থে ইহার অনেক উদাহরণ আছে। তন্মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য, যথা,—গণান্ন, গণিকান্ন, বার্দ্ধুষিকান্ন, শূদ্রান্ন, চিকিৎসকান্ন ইত্যাদি। ঐরূপ ব্যাধ, পতিত, রজক, তক্ষক, শৌণ্ডিক, পিশুন, ভার্য্যাট প্রভৃতি ব্যক্তির অন্ন পরিত্যাজ্য। (গৌতম, ১৪শ অধ্যায়)।

(গ) আবার কয়েকটি জাতির স্পৃষ্ট অন্নজলাদি অভক্ষ্য ও জাতিভ্রংশকর বলিয়া পরিগণিত হইত। ইহাদিগকে অস্পৃশ্য জাতি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

(ঘ) ঐরূপ কেশ-কীট-যুক্ত, ধূলি-ভস্মাদিপূর্ণ অন্ন পরিত্যাজ্য। ব্রাহ্মণের পক্ষে গুরু ভিন্ন অন্যের উচ্ছিষ্টও ত্যাজ্য ছিল।

উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলি ভাল করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে, কালক্রমে সমাজে এই নিয়মগুলির আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। কতকগুলি স্থলে দেখা যায়, সামাজিক অপকার-ভয়ে বা স্বাস্থ্যহানির ভয়ে এই নিষেধ বিধিবদ্ধ হইয়াছিল—যেমন গোমাংস ও বরাহমাংস। কতিপয় স্থলে স্বাস্থ্যহানির ভয়ে ঐরূপ বিধির উৎপত্তি হইয়াছিল -যেমন চর্ম্মকারাদি নীচকার্য্যরত ব্যক্তির অন্ন উচ্ছিষ্ট-ভোজনও বোধ হয় রোগাশঙ্কায় নিষিদ্ধ হইয়াছিল। আবার অনেক স্থলে জাতিগত বা সম্প্রদায়গত বিদ্বেষের ফলে বা অন্য কোন কারণবশতঃ এইরূপ নিষেধের উৎপত্তি হইয়াছিল মনে করা যায়—যেমন গণিকান্ন, চিকিৎসক ও সোমবিক্রয়ীর অন্ন, বার্দ্ধুষিকের অন্ন, ইত্যাদি। এই স্থলে সমাজ গণিকাদিকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া উহাদের অন্নও দুষ্ট বলিয়া গণ্য করিত। চিকিৎসক, বার্দ্ধুষিক প্রভৃতি ব্রাহ্মণ হইলেও তাঁহাদের অন্ন অভক্ষ্য হইত। অন্ত্যজদিগকে তখন আর্য্যসমাজভুক্ত বলিয়া মনে করা হইত না।

জাতকে চণ্ডাল, পুক্কশ, নিষাদাদি জাতির অন্নপান-গ্রহণ জাতিভ্রংশকর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ইহারা গ্রাম ও নগরের মধ্যে স্থান পাইত না; গ্রামের বাহিরে বাস করিত। তাহারা ঘাতক, পাংশুল, ধাবক প্রভৃতির কার্য্য করিয়া জীবন যাপন করিত। সমাজ ইহাদিগকে বিধর্ম্মী আর্য্যসমাজবহিষ্কৃত বলিয়া পরিগণিত করিত।

এইসম্পর্কে আরও কয়েকটি কথা বলিবার আছে। প্রথমতঃ শীল-সদাচারযুক্ত শূদ্রাদি রন্ধনকার্য্যে নিযুক্ত হইত। গৌতমধর্ম্মসূত্রে ইহার বিশেষ উল্লেখ আছে। আপস্তম্বের (২।৩।৯।) মতে শূদ্র পাচক অন্নাদি প্রস্তুত করিতে পারিত। গৌতমের (১৭ অধ্যায়) মতে অভাবে পড়িলে শূদ্রের প্রদত্ত খাদ্যসামগ্রী গ্রহণ করিতে পারা যায়। গোপালক, নাপিত, কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত শূদ্র, পরিচারকাদিরও অন্ন গ্রহণ করা যাইত। আবার ব্রাহ্মণ পাককার্য্যে নিযুক্ত হইলে ব্রাহ্মণের পাতিত্য জন্মে, ইহা স্মৃতিদিগের মত। এই অবস্থায় মনে হয় যে, এই যুগের মাহানসিক, সূপকার, ঔদনিক, পাকমাংসিক প্রভৃতি শূদ্রজাতীয় ছিল।

সম্ভবতঃ পরবর্ত্তী যুগেই স্পর্শ-দোষাদি লইয়া কঠোর বিধিসমূহ রচিত হয়। বৌদ্ধ যুগের সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতা বোধ হয় এই সকল প্রতিক্রিয়ার মূলীভূত কারণ। বৌদ্ধশিক্ষা ও আচারের ফলে সামাজিক শাসন শিথিল হইলে উহা আবার কঠোরভাবে বিধিবদ্ধ হয়। স্পর্শদোষ-জনিত পাতকের কথাও এই সময়ে বিধিবদ্ধ হয়। আচারমাহাত্ম্যমূলক পরবর্ত্তী যুগের যে সকল স্মৃতিগ্রন্থের অংশবিশেষ আমাদের হস্তে আসিয়াছে, সেগুলিতে উহা বিশদভাবে পরিস্ফুট আছে। নানা কারণে এগুলির আবির্ভাব ঘটিয়াছে। উহার প্রথম কারণ ধর্ম্ম ও সমাজ-বিপ্লবের ভয়; দ্বিতীয় কারণ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ।

ব্রাহ্মণাদি নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার নিমিত্ত এই সকল বিধি কঠোর করিয়া ফেলিয়াছেন। এইরূপ বিধি অনেক জাতির মধ্যে দেখা যায়। স্বাতন্ত্র্য-রক্ষার্থ ভেদজ্ঞান পরিস্ফুট করার জন্যই এইগুলির উদ্ভব হয়। অনাচরণীয়দের মূলেও ঐ সকল কারণ নিহিত রহিয়াছে

অর্থশাস্ত্রে এই সম্পর্কে কয়েকটি বিধি দেখা যায়। এক স্থলে আমরা দেখিতে পাই, নীচ শূদ্রাদি ব্রাহ্মণকে বলপূর্ব্বক অভক্ষ্য ভোজন করাইলে তাহার বিশেষ দণ্ডের ব্যবস্থা আছে।

অর্থশাস্ত্রের যুগে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে উহার বিশেষত্ব ছিল। ইউরোপের মত এদেশে নির্যাতন ও অত্যাচার বড় বেশী হইত না। ধর্ম্মে রাজার হস্তক্ষেপের অধিকার না থাকায় এ বিষয়ে বাড়াবাড়ি হইবার সম্ভাবনা কিছু কম ছিল।

পাষণ্ড চণ্ডালাদির স্থান সমাজের বাহিরে ছিল। কৌটিল্যের মতে তাহাদিগকে নগরমধ্যে বাস করিতে দেওয়া অনুচিত। আর গ্রামে উহাদের সঙ্ঘ স্থাপন করিতে দেওয়া হইত না (বানপ্রস্থাদন্যঃ প্রব্রজিতভাবঃ সজাতাদন্যঃ সঙ্ঘঃ সমবায়িকাদন্যঃ সমুত্থায়িকঃ বা নাস্য জনপদমুপনিবিশেত—৪৮ পৃঃ)।

উত্তরকালে এই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বাড়িতে থাকে। বৌদ্ধেরা বিষম হিন্দুদ্বেষী হন। এই বিদ্বেষের ফলে কঠোর বিধিগুলি দিন দিন বাড়িতে থাকে।

কৌটিল্যের সামাজিক আদর্শ

অর্থশাস্ত্রের সামাজিক চিত্র-সম্বন্ধে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি ও যৎসামান্য পর্য্যালোচনায় যাহা বুঝিয়াছি, তাহা লইয়া অনেক কথা বলিলাম। এখন কৌটিল্যের সামাজিক আদর্শ সম্বন্ধে কিছু বলিব ও প্রসঙ্গক্রমে সে কাল ও এ কালের পার্থক্য এবং তাহার মূলীভূত কারণ লইয়া কিছু আলোচনা করিব।

অর্থশাস্ত্র হইতে যাহা বুঝা যায়, তাহাতে মনে হয় যে, কৌটিল্যের সামাজিক আদর্শ অনেক উচ্চ ছিল। উচ্চ বলিলে যে উহা এখনকার হিসাবে উচ্চ, তাহা নহে। এখন লোকতন্ত্রবাদের (democracy) দিন। সর্ব্ব লোকের সাম্য (equality) ও মনুষ্যমাত্রেরই সমান অধিকার (equal rights) এই যুগের নীতির ভিত্তি। যদি বর্ত্তমান জগতের

আদর্শ লইয়া আমাদিগকে কৌটিল্যের স্থান নিরূপণ করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহার আদর্শকে উচ্চ স্থান দেওয়া অসম্ভব। তিনি প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য আদর্শের পন্থানুসারী ছিলেন। চাতুর্ব্বর্ণ্য, ব্রাহ্মণপ্রাধান্য ও বেদপ্রামাণ্যে তাঁহার আস্থা ছিল। তিনি ভূয়োভূয়ঃ বলিয়াছেন

চতুর্ব্বর্ণাশ্রমো লোকে কৃতবর্ণাশ্রমস্থিতিঃ।
এব হি রক্ষিতো লোকে প্রসীদতি ন সীদতি॥

এই সকল বিষয়ে তিনি প্রাচীন আদর্শ অনুসরণ করিয়াছেন; উহাকে লুপ্ত করিতে চাহেন নাই; সমাজ ভাঙ্গিতে চাহেন নাই। নূতন কিছু গড়িয়া তিনি প্রাচীন সমাজের বিলোপ ঘটাইতে চাহেন নাই। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন,—

তস্মাৎ স্বধর্ম্মং ভূতানাং রাজা ন ব্যভিচারয়েৎ।
স্বধর্ম্মং সন্দধানো হি প্রেত্য চেহ চ নন্দতি॥

শ্রুতিকে তিনি বিদ্যাসমূহের মধ্যে প্রধান স্থান দিয়াছেন (ত্রয়ী বার্ত্তা দণ্ডনীতিরান্বীক্ষকীতি বিদ্যাঃ)। তাঁহার শাসনবিধিতে ব্রাহ্মণ-পরিহারের স্থান আছে, ব্রাহ্মণের অনেক বিশেষ অধিকার আছে। ঐরূপ ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদিরও বিশেষ বিশেষ অধিকার দেখিতে পাওয়া যায়।

সাম্যবাদে অবিশ্বাসী বলিয়াই কিন্তু তাঁহাকে আমরা নির্ম্মম ও নির্দ্দয় দণ্ডনীতির পরিপোষক রাজনীতিক বলিতে পারি না। সাম্যবাদ ভারতবর্ষে কখনই প্রবল হয় নাই—আজিও প্রবল হইতেছে না। অনেকে উহা আমাদের জাতিগত অবনতি বা কুসংস্কারজনিত বলিয়া মনে করেন। এই ধারণা কি পরিমাণে সত্য, সে সম্বন্ধে আমি কোন মতামত প্রকাশ করিতে চাহি না। তবে একটি কারণের নির্দ্দেশ দ্বারা বিষয়টি কিঞ্চিৎ বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

ইউরোপে সাম্যবাদপ্রচারের অনেকগুলি কারণ ঘটিয়াছে তন্মধ্যে প্রধান (কোন ইউরোপীয় গ্রন্থকারের মতে প্রধানতম) কারণ এই যে, উহা রাজনীতিক ও সামাজিক হিসাবে এবং আধ্যাত্মিক ভাবে মনুষ্যত্বের

উচ্চ আদর্শ-প্রসারের একমাত্র উপায় হইয়াছিল। এক কথায় বলিতে গেলে, ইউরোপীয় দার্শনিকমাত্রেই জীবনের ভোগসুখ লইয়া জীবনের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ নির্ণয় করিয়াছেন। আমাদের দেশের কর্ম্মবাদ ও কর্ম্মজনিত সুখদুঃখের উৎপত্তি ও অবসান ইউরোপে কখনই প্রবল হয় নাই। ইউরোপীয় দার্শনিকগণ কোনদিন এ দেশের ন্যায় পুনর্জ্জন্মে এত আস্থা স্থাপন করেন নাই। ফলে তাঁহারা বৈষম্য দেখিলেই উহার মূলোচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইউরোপে এই সংগ্রাম আজিও শেষ হয় নাই।

আমাদের দেশে কর্ম্মবাদের প্রভাবহেতু এই বৈষম্যের জন্য লোকে এত ব্যস্ত হয় নাই। এ দেশের মনীষিবৃন্দ এরূপ নিশ্চয় করিয়াছিলেন যে, মানুষ হাজার চেষ্টা করিলেও কখনই প্রত্যেককে সমান সুখে সুখী করিতে পারিবে না। সুখ ও দুঃখ লইয়া যে বৈষম্য, তাহার অনেকটা মানুষমাত্রেরই নিজ নিজ সদসৎ কর্ম্মের ফল।

দ্বিতীয়তঃ, এ দেশের সামাজিক গঠনের প্রকৃতি (Principles of Evolution) বিভিন্ন। ইউরোপের ন্যায় ভারতীয় সমাজে জাতিগত বিদ্বেষ ও বৈষম্য লইয়া ভীষণ সমর হয় নাই। এ দেশে বহুজাতীয় লোকের বাস ছিল এবং আছে। কিন্তু ইউরোপে যেমন প্রবল দুর্ব্বলের মূলোচ্ছেদ করিয়া, নিজ শক্তি বর্দ্ধিত করিয়া অপরকে বিনষ্ট করিয়াছে, এ দেশে কখনও তাহা হয় নাই। এক হিসাবে যেমন সাম্যমূলক জাতিগত রাষ্ট্র বাহির হইতে দেখিতে খড় সুন্দর, উহার গঠনের ইতিহাস তেমনই কদর্য্য। বর্ত্তমানে ইউরোপীয় জাতিবৃন্দ রাষ্ট্রপ্রজাগণের মধ্যে ভ্রাতৃভাব ও সমতা স্থাপন করিতেছেন, কিন্তু বিদেশীয় জাতিমাত্রই তাঁহাদের চক্ষুঃশূল। আর এই সমতা-স্থাপন ও নিজ জাতির প্রাধান্য-বিস্তার করিতে গিয়া কত বিশাল জাতির অস্তিত্ব যে বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় ভারতীয়গণ নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে, অথচ অন্যের অস্তিত্ব একেবারে বিলোপ করে নাই। এক দেশে,

এক প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতি বা শ্রেণীর লোক নির্ব্বিবাদে বাস করিয়াছে ও করিতেছে। ফলে আজিও সমাজের অঙ্গের মধ্যে নিম্নস্তরের বহু জাতির লোক স্থান পাইয়াছে; তাহাদের অস্তিত্ব আছে। প্রতীচ্যে তাহা হয় নাই। বিজয়ী জাতিই প্রবল হইয়াছে। বিজিত একেবারে সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে। এ সম্বন্ধে অধিক বলিতে চাহি না। তবে এইমাত্র দেখাইতে চাই যে, ভারতে আজিও বহু সভ্য-অসভ্য, নিম্ন-উন্নত জাতি পাশাপাশি নির্ব্বিবাদে বাস করিতেছে। আর ইউরোপ ও আমেরিকায় বিজিতের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে। নিগ্রো, রেড ইণ্ডিয়ান বা অন্য যাহারা আজিও বাঁচিয়া আছে, তাহাদের নিত্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে।

যে কোন কারণেই হউক, কৌটিল্যে সাম্যবাদ নাই; কিন্তু তাই বলিয়া কৌটিল্যের সামাজিক আদর্শ সঙ্কীর্ণ নহে। কৌটিল্যের বহু স্থলে জনসাধারণের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি দেখিতে পাই। এ ভিন্ন তাঁহার আর একটি গৌরবের কথা এই যে, যে যুগে যবন দার্শনিক এরিষ্টটল দাসত্বের সমর্থন করিয়াছেন, সেই যুগেই কৌটিল্য উহা সমূলে উচ্ছেদ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। সুসভ্য ইউরোপে বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে দাসত্ব-প্রথা বহু চেষ্টায় বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ভারতবাসীর গৌরবের কথা এই যে, দ্বিসহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে একজন ভারতীয় দার্শনিক উহার উচ্ছেদকল্পে জগতে প্রথম চেষ্টা করিয়াছিলেন।

শুধু ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় লইয়া কৌটিল্যের সমাজ গঠিত হয় নাই। নিম্ন জাতির লোকেরও উহাতে বিশিষ্ট স্থান ছিল। প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকগণের মত তিনি সমাজকে একটিমাত্র জীবদেহস্বরূপ মনে করিয়া সকলকেই উহার বিশিষ্ট অঙ্গে স্থান দিয়া গিয়াছেন।

প্রজাসাধারণের সহিত রাষ্ট্রশক্তির বিশিষ্ট সম্বন্ধ ছিল। রাজশক্তি কেবল দুষ্টের দমনে পর্য্যবসিত হইত না। প্রজাকে সকল প্রকারে সাহায্য করাই ছিল রাজার ও রাজশক্তির আদর্শ। যে যেরূপ শ্রেণীর লোকই হউক না কেন, রাজা রাজকোষ হইতে তাহার সেইরূপ সাহায্যের

ব্যবস্থা করিতেন। লোকের জীবন-রক্ষা ও ঐহিক-পারত্রিক উন্নতি, সর্ব্ববিষয়েই রাষ্ট্রশক্তির সাহায্য ছিল। এগুলির সঙ্গে ইউরোপের ন্যায় ধর্ম্মের নামে উৎপীড়ন ও অত্যাচার মিশ্রিত হইত না। রাজা কখনও প্রজার ধর্ম্মবিশ্বাসে হাত দিতেন না। আধ্যাত্মিক উৎকর্ষে রাজার হস্তক্ষেপের উপায়ই ছিল না।

প্রজার স্বায়ত্ত শাসনের ব্যবস্থা ছিল। গ্রামে গ্রামবাসিগণ, নগরে নগরবাসিগণ, জাতির মধ্যে মণ্ডলেরা, সঙ্ঘের মধ্যে সঙ্ঘমুখ্যেরা কর্ত্তৃত্ব করিতেন। যখন বিপদ্-নিবারণ তাঁহাদের ক্ষমতার অতিরিক্ত হইত, তখন রাজা উহাতে হস্তক্ষেপ করিতেন। রাজপ্রণীত বিধির ফলে সম্প্রদায়বিশেষের বা ব্যক্তিবিশেষের অত্যাচার করিবার উপায় ছিল না। রাজশাসনে অত্যাচার-হিংসা নিবারিত হইত। ধনবান্ কর্ত্তৃক দরিদ্রের উৎপীড়নও নিবারিত হইত। দ্রব্যের মূল্য-নির্দ্ধারণ ও কর্ম্মকর দাসাদির বেতন-নির্দ্ধারণের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এক কথায় বলিতে গেলে কৌটিল্যের আদর্শ রাষ্ট্র লোকহিতৈষণা ও অর্থনৈতিক বিধির উপর স্থাপিত ছিল।

ক্রমে সেই সকল আদর্শ বিলুপ্ত হইয়াছে। আজ ভারতবাসীর দুর্দ্দশার পরাকাষ্ঠা হইয়াছে। রাষ্ট্রশক্তি অশোকের ধর্ম্মনীতির সঙ্গে সঙ্গেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। কৌটিল্যের আদর্শ রাষ্ট্রও সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হইয়াছিল। ভারত ক্রমে বিদেশীয় আক্রমণকারীর ক্রীড়াভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু তখনও জাতীয় জীবনীশক্তি বিলুপ্ত হয় নাই। তখনও লোকে কর্ম্মজীবন ভুলে নাই। তাহারা প্রয়োজনমত সমাজ-বিধির সংস্কার করিতে বা নূতন করিয়া গড়িতে পারিত। কিছু কাল পরেই হিন্দুশক্তি আবার উত্থিত হইয়াছিল। গুপ্ত, চালুক্য, রাষ্ট্রকূট, পাল, সেন প্রভৃতি রাজবংশীয় নরপতিগণ দেশের গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কিন্তু এ পুনরভ্যুদয় স্থায়ী হয় নাই। ভারতীয় সমাজের জীবনীশক্তি ক্রমে হ্রাস পাইতেছিল। ভারতবাসী এক একবার মাথা তুলিলেও

নানা কারণে নিজের শক্তি বা তেজ অব্যাহত রাখিতে পারে নাই। ইহার মূলে অনেকগুলি কারণ নিহিত আছে। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে উহার সমালোচনা সম্ভব নহে। তবে এই মাত্র বলিতে পারা যায় যে, একাধিক কারণে ভারতবাসী নিজ শক্তির অপচয় করিয়াছে ও করিতেছে। তন্মধ্যে প্রধান কয়েকটি কারণ এই,—(ক) কর্ম্মজীবনের আদর্শের বিকার, (খ) সামাজিক অবসাদ, (গ) স্বাধীন চিন্তার তিরোভাব, (ঘ) সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, (ঙ) বৌদ্ধ-শিক্ষার প্রতিক্রিয়ার ফল।

এসম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিতে চাহি না। ভারতের ইতিহাস-পাঠকগণ ইহা অবগত আছেন। ভারতবাসী ক্রমে নিজের শক্তির অপচয় করিয়া আসিতেছে। কর্ম্মজীবনের আদর্শ একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। ভ্রান্ত নীতির বশবর্ত্তী হইয়া ক্রমে স্বাধীন চিন্তা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। জনসাধারণ প্রাচীন আদর্শের দোহাই দিয়া একেবারে গতানুগতিক হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা দেশকালপাত্রভেদে বিচার করিতে পারে না। ব্রাহ্মণের অবসাদের সঙ্গে অনেক উচ্চ আদর্শ বিলুপ্ত হইয়াছে। রাজশক্তির বিলোপে সমাজশক্তি ক্ষীণতর হইয়াছে। সর্ব্ব বিষয়েই এখন দৈন্য দেখা দিয়াছে।

ক্রমে আমাদের জাতীয় জীবনে সংশয় আসিয়াছে। আবার মাথা তুলিতে হইলে আমাদের শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে, দুর্নীতির বিলোপ করিতে হইবে। এখন জগতের সর্ব্বত্রই অভ্যুদয়ের যুগ। আর এখন গতানুগতিক হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না।

জাতীয় জীবনের পুনর্গঠন করিতে হইলে আমাদিগকে হিন্দুসমাজ পুনরায় গঠিত করিতে হইবে। আর এই পুনর্গঠনে কেবল প্রতীচ্যের আদর্শের অনুকরণে চলিলে হইবে না। আমাদের নিজস্ব যাহা আছে, তাহার স্মৃতি লইয়া নাড়াচাড়া করিলেও আবার শক্তি ফিরিয়া আসিবে না। দেশকালানুযায়ী সমাজ আবার নূতন করিয়া স্থাপন করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে।